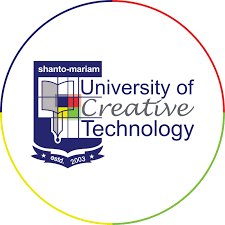
**শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি**  


**গবেষণার শিরোনাম:**

**পথ শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক পরীক্ষা**

বিষয় কোড : SOA-৬৩০৭

**তত্ত্বাবধায়ক**

**মোঃ মেহেদী হাসান**  
সহযোগী অধ্যাপক  
সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ  
শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি

**উপস্থাপনায়**

**শারমীনা খানম**

আই.ডি: ২৩৩৫৪১০০১

ব্যাচ নং: ৪৯ তম

এম.এস.এস. (**ফাইনাল**)   
সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ

শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি

# মুখবন্ধ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সমাজবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা মানুষের সামাজিক জীবন, বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালনা করে। সমাজবিজ্ঞান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং সমাজ পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও মাত্রা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সমাধানের কার্যকর পথনির্দেশ সম্ভব হয়।

সামাজিক গবেষণার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হলো পথশিশু সমস্যা। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশেষত বাংলাদেশের মতো দেশে পথশিশুর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনেও এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় *“পথশিশুদের অর্থ-সামাজিক অবস্থা”* শীর্ষক গবেষণাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

এই গবেষণার মাধ্যমে পথশিশুদের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, জীবনযাত্রার ধারা, শিক্ষাগত অবস্থা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা গবেষণাকে অধিকতর প্রমাণভিত্তিক করেছে।

গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতিগত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে, যেমন—সার্ভে, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে পথশিশুদের জীবনমানের একটি বাস্তবচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা, নেশাজাত দ্রব্যে সম্পৃক্ততা, কর্মসংস্থানের ধরণ, পারিবারিক পটভূমি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ গবেষণা পরিচালনায় শিক্ষকমণ্ডলী, সহপাঠী এবং অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের আন্তরিক সহযোগিতা অপরিসীম ভূমিকা রেখেছে। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করা যায়, গবেষণার ফলাফল নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পথশিশু সমস্যার টেকসই সমাধানে সহায়ক হবে

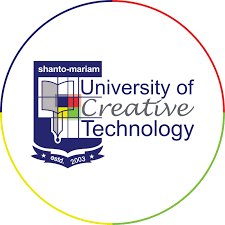
# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমাজবিজ্ঞানে গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা মানবজীবনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের শেষ বর্ষের এমএসএস ছাত্রী/ছাত্রীদের কোন না কোন বিষয়ের ওপর মনোগ্রাফ তৈরি করতে হয়। এই মনোগ্রাফ তৈরিতে যারা সহমত, সহযোগিতা, উদারভাবে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণায় পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়ার কৃতিত্ব আমার পরামর্শক **মোঃ মেহেদী হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ।** তিনি বিষয়বস্তুর নির্ধারণ করেই থেমে যাননি, বরং গবেষণা কাজের প্রতিটি ধাপে তাঁর মূল্যবান উপদেশ এবং নির্দেশনায় গবেষণাকে সফল করতে সাহায্য করেছেন।

এছাড়াও আমার গবেষণায় বিভিন্ন স্তরে যারা নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

**কৃতজ্ঞতায়:**   
শারমীনা খানম   
আই.ডি. নং: ২৩৩৫৪১০০১   
এম.এস.এস. (**ফাইনাল**)   
সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ

**শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি  
সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ  
ঢাকা, বাংলাদেশ**  


# অনুমোদন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে,  
  
“**পথ শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক পরীক্ষা**”  
শীর্ষক গবেষণাপত্রটি সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের **এম.এস.এস. (ফাইনাল)** ডিগ্রির আংশিক পূরণের জন্য দাখিলকৃত শিক্ষার্থী  
**শারমীনা খানম**(**আই.ডি: ২৩৩৫৪১০০১**) কর্তৃক সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণার ফলাফল।  
  
গবেষণাপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে এবং আমি মনে করি এটি জমাদানের জন্য উপযুক্ত।

**তত্ত্বাবধায়ক**

**মোঃ মেহেদী হাসান**  
সহযোগী অধ্যাপক  
সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান বিভাগ  
শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি  
স্বাক্ষর: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
তারিখ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত পথশিশুদের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা, পেশাগত সম্পৃক্ততা, ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা এবং পুনর্বাসনের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, অধিকাংশ পথশিশু (৫৬%) এর বয়স ১০–১৫ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক সময়। তাদের মধ্যে ৫৬% কোনো না কোনো কাজে সম্পৃক্ত, প্রধানত হকারি, টোকাই কার্যক্রম ও ভিক্ষাবৃত্তিতে, যা তাদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষার দিক থেকে দেখা যায় যে ৪৪% শিশু সম্পূর্ণ নিরক্ষর, ৫৬% প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ এবং মাত্র ১২% শিশু মাধ্যমিক স্তরের নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছে। তবুও আশার আলো হলো—৫৮% শিশু পড়াশোনা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক, যা নির্দেশ করে যে উপযুক্ত সহায়তা ও নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তারা পুনরায় শিক্ষার ধারায় যুক্ত হতে পারে।

মাদকাসক্তি একটি বড় চ্যালেঞ্জ; গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৮০% শিশু কোনো না কোনো নেশাজাত দ্রব্যের সংস্পর্শে এসেছে। তবে প্রায় ২০% শিশু এখনো নেশা থেকে মুক্ত, যা সঠিক সময়ে প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ নিলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করে। অভিবাসনের প্রেক্ষাপটে ৭৪% শিশু গ্রাম থেকে শহরে এসেছে, যা গ্রামীণ দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানের অভাব এবং পরিবার ভাঙনের মতো কারণকে পথশিশুত্ব বৃদ্ধির মূল চালক হিসেবে চিহ্নিত করে।

এই গবেষণা থেকে স্পষ্ট যে পথশিশু সমস্যাটি কেবল একটি মানবিক সংকট নয়, বরং একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চ্যালেঞ্জ, যা জাতির ভবিষ্যৎ মানবসম্পদকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গবেষণার ফলাফল নীতি-নির্ধারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে—যথাযথ শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, নিরাপদ পুনর্বাসন এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে পথশিশুরা কেবল ঝুঁকিপূর্ণ জীবন থেকে মুক্ত হবে না, বরং দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

**গুরুত্বপূর্ণ -শব্দসমূহ :** পথশিশু, আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, শিশুশ্রম, ভিক্ষাবৃত্তি, মাদকাসক্তি, অভিবাসন, পরিবার ভাঙন, পুনর্বাসন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

সূচিপত্র

[মুখবন্ধ 2](#_Toc208911407)

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার 3](#_Toc208911408)

[অনুমোদন পত্র 4](#_Toc208911409)

[সারসংক্ষেপ 5](#_Toc208911410)

[অধ্যায় ১: ভূমিকা 10](#_Toc208911411)

[১.১ গবেষণার পটভূমি 10](#_Toc208911412)

[১.২ গবেষণা সমস্যার বিবৃতি 12](#_Toc208911413)

[১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য 14](#_Toc208911414)

[১.৪ গবেষণার প্রশ্ন 16](#_Toc208911415)

[১.৫ গবেষণার গুরুত্ব 17](#_Toc208911416)

[১.৬ গবেষণার যৌক্তিকতা : 18](#_Toc208911417)

[অধ্যায় ২: পটভূমি ও সাহিত্য পর্যালোচনা 20](#_Toc208911418)

[২.১ পটভূমি পথশিশু শব্দের ধারণা 20](#_Toc208911419)

[বাংলাদেশে শহরায়ণ ও দারিদ্র্যের প্রেক্ষিত 20](#_Toc208911420)

[পথশিশু সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট 20](#_Toc208911421)

[পথশিশু সমস্যার সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট 21](#_Toc208911422)

[২.২ সাহিত্য পর্যালোচনা 21](#_Toc208911423)

[পূর্ববর্তী গবেষণার ফলাফল (বাংলাদেশ) 21](#_Toc208911424)

[পথশিশুদের জীবনযাত্রা ও ঝুঁকি 22](#_Toc208911425)

[আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট 22](#_Toc208911426)

[সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 22](#_Toc208911427)

[আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থার কার্যক্রম 22](#_Toc208911428)

[কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে পথশিশুদের অবস্থা 23](#_Toc208911429)

[মনোসামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য 24](#_Toc208911430)

[প্রযুক্তির সাথে পথশিশুদের সম্পর্ক 25](#_Toc208911431)

[পুনর্বাসন কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা 25](#_Toc208911432)

[পথশিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও বাধাসমূহ 28](#_Toc208911433)

[২.৩ বাংলাদেশের পথশিশুদের জীবনমান: পূর্ববর্তী গবেষণা, ফাঁকসমূহ ও নতুন সংযোজন 31](#_Toc208911434)

[বর্তমান গবেষণার নতুন সংযোজিত দিকসমূহ 34](#_Toc208911435)

[অধ্যায় ৩ : গবেষণা পদ্ধতি 35](#_Toc208911436)

[৩.১ গবেষণা নকশা ও পদ্ধতির ধরন 35](#_Toc208911437)

[৩.২ গবেষণাক্ষেত্র 36](#_Toc208911438)

[৩.৩ গবেষণা জনসংখ্যা ও অন্তর্ভুক্তি-বর্জন মানদণ্ড 37](#_Toc208911439)

[৩.৪ নমুনা নকশা ও নমুনা আকার 37](#_Toc208911440)

[৩.৫ উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও ভেরিয়েবল 39](#_Toc208911441)

[৩.৬ উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া 40](#_Toc208911442)

[৩.৭ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ পরিকল্পনা 42](#_Toc208911443)

[৩.৮ গুণমান নিশ্চয়তা (Quality Assurance) 44](#_Toc208911444)

[৩.৯ নৈতিকতা, সুরক্ষা ও শিশু-অধিকার 45](#_Toc208911445)

[৩.১০ সময়সূচি (Timeline) 46](#_Toc208911446)

[৩.১১ গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও বৈধতা 47](#_Toc208911447)

[৩.১২ সীমাবদ্ধতা 47](#_Toc208911448)

[৩.১৩ ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা 48](#_Toc208911449)

[অধ্যায় ৪: গবেষণার ফলাফল 49](#_Toc208911450)

[৪.১ বয়সভিত্তিক বণ্টন 49](#_Toc208911451)

[৪.২ কর্মরত ও কর্মহীন শিশু 50](#_Toc208911452)

[৪.৩ ভিক্ষাবৃত্তি অবস্থা 51](#_Toc208911453)

[৪.৪ শিক্ষাগত অবস্থা 52](#_Toc208911454)

[৪.৫ নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণের অবস্থা 53](#_Toc208911455)

[৪.৬ পিতার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি 55](#_Toc208911456)

[৪.৭ মা আছে বা নেই 56](#_Toc208911457)

[৪.৮ শিশু কোথায় থাকে 57](#_Toc208911458)

[৪.৯ আয় সম্পর্কিত তথ্য 57](#_Toc208911459)

[৪.১০ লেখাপড়া করতে চায় 58](#_Toc208911460)

[৪.১১ সহায়তা পাওয়া বা না পাওয়া 59](#_Toc208911461)

[৪.১২ অপহরণের বাসায় কাজ করতে চায় বা চায় না 60](#_Toc208911462)

[৪.১৩ যৌন/মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বা হয়নি 61](#_Toc208911463)

[৪.১৪ তথ্যনির্ভর সমাধান–উপধারা 62](#_Toc208911464)

[১) কৌশলগত লক্ষ্য 62](#_Toc208911465)

[২) লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপ প্যাকেজ (What Works) 63](#_Toc208911466)

[৩) তথ্যব্যবস্থা (MIS) ও নজরদারি 64](#_Toc208911467)

[৪) বাস্তবায়ন সময়রেখা 64](#_Toc208911468)

[৫) অংশীদার ও ভূমিকা 64](#_Toc208911469)

[৬) ন্যূনতম বাজেট (ইঙ্গিতমূলক, বছরে) 65](#_Toc208911470)

[৭) ঝুঁকি ও প্রশমন 65](#_Toc208911471)

[৮) নৈতিকতা ও শিশু-সুরক্ষা 65](#_Toc208911472)

[৯) মূল্যায়ন ও প্রমাণ (M&E) 66](#_Toc208911473)

[প্রত্যাশিত প্রভাব (২ বছরে) 66](#_Toc208911474)

[পঞ্চম অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা 66](#_Toc208911475)

[৫.১ শিক্ষাগত অবস্থা ও নিরক্ষরতার চিত্র 66](#_Toc208911476)

[৫.২ পেশাগত সম্পৃক্ততা 67](#_Toc208911477)

[৫.৩ নেশাজাত দ্রব্যে সম্পৃক্ততা 67](#_Toc208911478)

[৫.৪ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা 67](#_Toc208911479)

[ষষ্ঠ অধ্যায় 68](#_Toc208911480)

[৬.১ এক নজরে ঢাকার শহরে পথশিশু নিয়ে যেসব এনজিও কাজ করে তাদের তালিকা 68](#_Toc208911481)

[ঢাকা শহরে সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের জন্য পরিচিত সেন্টারহোম ও ওপেন স্কুল সমূহ 68](#_Toc208911482)

[মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 68](#_Toc208911483)

[মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 68](#_Toc208911484)

[অপরাজেয় 69](#_Toc208911485)

[CACPV Project 69](#_Toc208911486)

[PCAR Project Dhaka 70](#_Toc208911487)

[অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 70](#_Toc208911488)

[সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশমালা 70](#_Toc208911489)

[৭.১ উপসংহার 70](#_Toc208911490)

[৭.২ সুপারিশমালা 71](#_Toc208911491)

[৭.৩ সমাপনী মন্তব্য 72](#_Toc208911492)

[গ্রন্থপঞ্জি (References) 78](#_Toc208911493)

# অধ্যায় ১: ভূমিকা

## ১.১ গবেষণার পটভূমি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ যেখানে দারিদ্র্য, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সীমিত সম্পদ এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরমুখী অভিবাসনের কারণে বহুমুখী সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম গুরুতর একটি সমস্যা হলো পথশিশু সমস্যা। পথশিশু বলতে সাধারণত এমন শিশুদের বোঝানো হয় যারা জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ রাস্তা বা খোলা আকাশের নিচে কাটায় এবং যাদের নিরাপদ আবাসন, পরিবারের তত্ত্বাবধান ও মৌলিক চাহিদা পূরণের কোনো নিশ্চয়তা নেই। শহরের ফুটপাত, রেলস্টেশন, বাজার, পার্ক বা জনবহুল স্থানগুলোতেই তাদের দিন-রাত কেটে যায়।

দেশের সামগ্রিক নগরায়ণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অবহেলা এবং পারিবারিক অস্থিতিশীলতার কারণে এই শিশুরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে রাস্তাই তাদের একমাত্র জীবনের অবলম্বন হয়ে ওঠে। ফলে পথশিশুরা সমাজের এক অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। এরা খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে।

পথশিশুর শ্রেণিবিন্যাস :

পথশিশুদের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ ভিন্ন হওয়ায় তাদেরকে সাধারণত তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

* পথবাসী শিশু: এরা সম্পূর্ণরূপে রাস্তার উপর নির্ভরশীল এবং পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। খাওয়া, ঘুমানো, কাজ করা থেকে শুরু করে সবকিছুই রাস্তার পরিবেশে ঘটে।
* পথে কর্মরত শিশু: এরা জীবিকার প্রয়োজনে সারাদিন রাস্তায় বিভিন্ন কাজ করে, যেমন হকারি, গাড়ি পরিষ্কার, জুতা পালিশ, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি। তবে রাত শেষে কোনো না কোনোভাবে পরিবার বা আশ্রয়স্থলে ফিরে যায়। অর্থাৎ তাদের পরিবারের সাথে আংশিক সংযোগ রয়ে যায়।
* রাস্তা-সংক্রান্ত পরিবারের শিশু: এরা তাদের পরিবারসহ বস্তি বা রাস্তার ধারে বসবাস করে। পরিবারও স্থায়ী ঠিকানাহীন হওয়ায় শিশুরাও মূলত রাস্তার জীবনধারার অংশ হয়ে ওঠে।

পথশিশুর সংখ্যা ও বণ্টন :

গবেষণা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের প্রধান নগরীগুলোতে বিপুল সংখ্যক পথশিশু রয়েছে। রাজধানী ঢাকা শহরে প্রায় ২,৪৯,২০০ জন পথশিশু বসবাস করছে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে প্রায় ৫৫,৮৫৬ জন, খুলনায় ৪১,৪৭৪ জন, রাজশাহীতে ২০,৪২৬ জন, বরিশালে ৯,৭৭১ জন এবং সিলেটে ১৩,১৬৫ জন পথশিশু রয়েছে। সর্বমোট ২০০৫ সালে সারা দেশে প্রায় ৬,৭৯,৭২৮ জন পথশিশুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে পথশিশুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১১,৪৪,৭৫৪ জন। বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৪ সালে এ সংখ্যা প্রায় ১৬,১৫,৩৩০ জনে পৌঁছাবে। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয় যে বাংলাদেশে পথশিশু সমস্যা কেবলমাত্র বিদ্যমান নয়, বরং সময়ের সাথে সাথে তা এক ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

পথশিশুর সামাজিক ও আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের পথশিশুদের বেশিরভাগই ৬ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী। এদের মধ্যে ছেলে শিশুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। মেয়ে শিশুর সংখ্যা কম হওয়ার অন্যতম কারণ হলো দরিদ্র পরিবারগুলোতে অনেক সময় অল্পবয়সে (১২-১৩ বছরেই) মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় অথবা গৃহকর্মীর কাজে পাঠানো হয়। ফলে তারা সরাসরি রাস্তায় না থেকে অন্যভাবে শোষণের শিকার হয়।

পথশিশুরা সাধারণত পরিবারের সাপোর্ট থেকে বিচ্ছিন্ন। কেউ পিতামাতাহীন এতিম, কেউ পরিবার থেকে হারিয়ে গেছে বা পালিয়ে এসেছে। এদের জীবনধারণ মূলত অনানুষ্ঠানিক খাতের আয় এর ওপর নির্ভরশীল। ভিক্ষাবৃত্তি, ঠেলাগাড়ি চালানো, হকারি, রিকশা গ্যারেজে কাজ, ভাঙারী সংগ্রহ, গাড়ি পরিষ্কার, কুলি-মজুরি বা ছোটখাট চুরিচামারি—এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মাধ্যমে তারা অল্প আয় করে বেঁচে থাকে।

কঠিন এই জীবনে পথশিশুরা নানা ধরনের নির্যাতন ও শোষণের শিকার হয়। তারা শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, অপরাধীচক্রের ফাঁদ, মাদকাসক্তি এবং নানা সামাজিক বিপদের সম্মুখীন হয়। স্বাস্থ্যসেবার অভাব, অপুষ্টি, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া, নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক অবহেলা—সব মিলিয়ে পথশিশুরা এক চরম অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে বেড়ে ওঠে।

## ১.২ গবেষণা সমস্যার বিবৃতি

উপরোক্ত প্রেক্ষাপট থেকে সুস্পষ্ট যে পথশিশু সমস্যা বাংলাদেশের নগর সমাজের এক জটিল ও বহুমাত্রিক সামাজিক সংকট। সমাজের এক দুর্বল, প্রান্তিক ও অবহেলিত অংশ হিসেবে পথশিশুরা ন্যূনতম জীবনমান থেকেও বঞ্চিত থেকে মানবিক, সামাজিক ও আর্থসামাজিক দিক থেকে চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অঞ্চলে এ সমস্যা সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার শিশু রাস্তাঘাট, পার্ক, ফুটপাত, বাসস্ট্যান্ড কিংবা রেলস্টেশনে দিন কাটাচ্ছে এবং রাতযাপন করছে। এদের জীবনে কোনো স্থিতিশীলতা নেই; প্রতিটি দিন তাদের কাছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি।

A pie chart with different colored circles

AI-generated content may be incorrect.এই শিশুদের আর্থসামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এরা নিরাপদ বাসস্থান থেকে বঞ্চিত, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভুগছে, স্বাস্থ্যসেবার কোনো নিশ্চয়তা নেই, এবং শিক্ষার অধিকার থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভিক্ষাবৃত্তি, হকারি, ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ, রিকশার গ্যারেজে কাজ কিংবা অন্য কোনো অনানুষ্ঠানিক শ্রমে নিয়োজিত থেকে সামান্য আয় করে টিকে থাকার চেষ্টা করে। এই নগণ্য আয় তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ অপ্রতুল, ফলে তারা অপুষ্টি, রোগব্যাধি ও চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়।

পরিবার ও সমাজের মূলধারার সাপোর্ট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে পথশিশুরা নানা ধরনের ঝুঁকির মধ্যে বেড়ে ওঠে। তাদের অনেকেই অপরাধচক্র, মাদকদ্রব্য ব্যবসা কিংবা ভ্রষ্টাচারের শিকার হয়। এরা প্রায়শই শারীরিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন এবং মানসিক সহিংসতার শিকার হয়, যার ফলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং তারা সমাজের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়তে পারে। ফলে পথশিশু সমস্যা কেবল মানবিক সংকট নয়; এটি নগর সমাজব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

A graph of a number of children

AI-generated content may be incorrect.অন্যদিকে, যদিও সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে শিশু কল্যাণ ও সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তথাপি পথশিশুদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। তাদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনও পর্যাপ্ত ও গভীর সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা-ভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। বিশেষত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে পথশিশু সমস্যার ব্যাপকতা থাকা সত্ত্বেও তাদের দৈনন্দিন জীবনধারা, আয়ের উৎস, সামাজিক সম্পর্ক, মানসিক অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ সীমিত।

ফলে গবেষণার কেন্দ্রীয় সমস্যা বা মূল প্রশ্ন দাঁড়ায়:  
“ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পথশিশুদের আর্থসামাজিক অবস্থা কিরূপ, এবং কী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট তাদেরকে এই পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে?”

বর্তমান গবেষণা এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পথশিশু সমস্যার বাস্তব অবস্থা ও অন্তর্নিহিত কারণসমূহ সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদঘাটন করবে। একই সঙ্গে এটি পথশিশু সমস্যার বহুমাত্রিক দিকগুলো চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে তাদের জীবনমান উন্নয়নের সম্ভাব্য পথ ও করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণে একটি প্রমাণভিত্তিক ভিত্তি সরবরাহ করবে।

## ১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার পথশিশুদের সামগ্রিক আর্থসামাজিক অবস্থার একটি প্রমাণভিত্তিক চিত্র উপস্থাপন করা। অর্থাৎ তাদের জীবনমান, ঝুঁকি ও সমস্যাবলি, সহায়ক নেটওয়ার্ক এবং উন্নয়ন-সম্ভাবনা সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করা এবং নীতি ও কর্মসূচির জন্য ব্যবহারযোগ্য সুপারিশ প্রদান করা। দেশে পথশিশুর সংখ্যা বর্তমানে কয়েক মিলিয়নেরও বেশি, যা সমস্যার মাত্রা ও জরুরতকে স্পষ্ট করে তুলেছে। তাই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকেন্দ্রিক একটি সূক্ষ্ম ও স্থানভিত্তিক গবেষণা সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ—

পারিবারিক পটভূমি ও বসবাসের অবস্থা নিরূপণ

পথশিশুদের পরিবারের সঙ্গে সংযোগের ধরন (সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আংশিক সংযুক্ত অথবা পরিবারসহ পথে থাকা), বর্তমান আবাস (ফুটপাত, স্টেশন, পার্ক, বস্তি ইত্যাদি), এবং দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তা পরিস্থিতি মানচিত্রায়ন।

কেন জরুরি: জাতীয় পর্যায়ের পূর্ববর্তী জরিপে দেখা গেছে নগরভিত্তিক পথশিশুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ প্রবণতা শহরাঞ্চলে যথেষ্ট তীব্র।

পরিমাপ/উৎস: কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নাবলি, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, অবস্থানভিত্তিক মানচিত্রায়ন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের শায়মপুর ও ধলপুর এলাকার মতো স্লাম-ক্লাস্টারের প্রেক্ষিত তথ্য।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অবস্থা এবং বঞ্চনা চিহ্নিতকরণ

শিশুদের সাক্ষরতার হার, বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার কারণ, সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য সমস্যা, সাধারণ রোগব্যাধি, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকারের চিত্র মূল্যায়ন।

কেন জরুরি: সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে রাস্তার অবস্থায় থাকা শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিরক্ষর এবং অধিকাংশ শিশু নিয়মিত অসুস্থ থাকে, যা দীর্ঘমেয়াদি বৈষম্যের ইঙ্গিত বহন করে।

পরিমাপ/উৎস: সাক্ষরতা পরীক্ষা, সাম্প্রতিক অসুস্থতা-সংক্রান্ত তথ্য, পুষ্টিমাপক সূচক, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের স্থান ও ব্যয়ের তথ্য।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ

গ্রামীণ দারিদ্র্য, পরিবার ভাঙন, সহিংসতা, অভিবাসন, মহামারিজনিত অর্থনৈতিক সংকট এবং নগরের অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারের টান কীভাবে শিশুদের রাস্তার জীবনে ঠেলে দেয় তা বিশ্লেষণ।

কেন জরুরি: রাস্তার জীবনে থাকা শিশুরা অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অবস্থান করায় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে জড়ানোর আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি।

পরিমাপ/উৎস: জীবনীগাথা সাক্ষাৎকার, কী-ইনফর্ম্যান্ট ইন্টারভিউ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং কাজ শুরুর বয়স ও সামাজিক নেটওয়ার্কের প্রভাব।

জীবিকা, আয়ের উৎস এবং শোষণ ও নিপীড়নের ঝুঁকি মূল্যায়ন

আয়ের ধরন (হকারি, ভাঙারি সংগ্রহ, দিনমজুরি, গ্যারেজকাজ, ভিক্ষা ইত্যাদি), আয়-ব্যয়ের হিসাব, দৈনিক কাজের সময়, এবং শারীরিক, যৌন ও মানসিক নির্যাতনের মাত্রা নিরূপণ। পাশাপাশি মাদকাসক্তি, অপরাধচক্রের প্রভাব এবং পুলিশের হয়রানির মতো ঝুঁকি চিহ্নিত করা।

কেন জরুরি: জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম এখনো উদ্বেগজনক। যদিও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের হার কিছুটা কমেছে, কিন্তু মোট কর্মরত শিশুর অনুপাত বেড়েছে, যা পথশিশুদের ক্ষেত্রে আরও বেশি ঝুঁকি তৈরি করছে।

পরিমাপ/উৎস: আয়ের উৎসভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস, মাসিক আয়-ব্যয়, কাজের ঘণ্টা, নির্যাতন সংক্রান্ত সূচক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার তথ্য।

শিক্ষা ও শিশুশ্রমের দ্বন্দ্ব এবং শিশুদের মোকাবিলা কৌশল

বিদ্যালয়ে ফেরার প্রতিবন্ধকতা (অর্থনৈতিক চাপ, বয়স, কাগজপত্রের অভাব, কাজের বাধ্যবাধকতা) চিহ্নিত করা। বিকল্প শিক্ষা, ব্রিজিং-ক্লাস বা অস্থায়ী শিক্ষা কর্মসূচির সুযোগ ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা। পাশাপাশি শিশুদের নিজেদের টিকে থাকার কৌশল ও সহায়ক উৎস বিশ্লেষণ।

কেন জরুরি: শিক্ষা সুযোগ বৃদ্ধি ছাড়া শিশুশ্রম হ্রাস করা সম্ভব নয়। শিশুদের জন্য শিক্ষা-ভিত্তিক সমাধান দীর্ঘমেয়াদে টেকসই পরিবর্তন আনতে পারে।

পরিমাপ/উৎস: বিদ্যালয়ে ভর্তির আগ্রহ, প্রতিবন্ধকতার কারণ, বিকল্প শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং মৌলিক সাক্ষরতা ও গণিত দক্ষতার পরিমাপ।

বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের কার্যকারিতা মূল্যায়ন

পথশিশুদের জন্য পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্র, মোবাইল স্কুল, স্বাস্থ্য শিবির, পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং কেস-ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমের কভারেজ, গুণমান, অংশগ্রহণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ।

কেন জরুরি: অতীতের প্রবণতা ও সাম্প্রতিক তথ্য ইঙ্গিত করে যে বিদ্যমান প্রোগ্রামগুলোকে লক্ষ্যভিত্তিক ও প্রমাণভিত্তিক করতে হবে।

পরিমাপ/উৎস: প্রোগ্রাম লজিক মডেল, ফলাফলভিত্তিক সূচক, অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া এবং স্থানীয় সংস্থার সংগৃহীত তথ্য।

নীতিগত সুপারিশ ও স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রেক্ষাপটে স্থানভিত্তিক সমাধান নির্ধারণ করা। যেমন—হটস্পটভিত্তিক আউটরিচ, ওয়ার্ড পর্যায়ে কেস ম্যানেজমেন্ট, মোবাইল স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র এবং প্রাথমিক পর্যায়ের হস্তক্ষেপ।

কেন জরুরি: স্লাম ও অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে দারিদ্র্যের ঘনত্ব বেশি, তাই লক্ষ্যভিত্তিক সেবা ছাড়া টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

পরিমাপ/উৎস: নীতিপত্র, পরিবর্তনের ধারণামূলক কাঠামো, খরচ ও কভারেজ বিশ্লেষণ এবং ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা।

## ১.৪ গবেষণার প্রশ্ন

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ও সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত মূল প্রশ্নসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

1. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পথশিশুদের পারিবারিক পটভূমি ও বর্তমান জীবনযাত্রার অবস্থা কি-রূপ, বিশেষ করে বাসস্থান, অভ্যস্ত কাজের ধরন ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে?
2. পথশিশুতে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ কী-কী, যেমন পরিবার ভাঙন, অভাব, অভিবাসন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি?
3. শিশুদের জীবিকা নির্বাহের উৎস ও ধরনের কাজ কি-গুলি এবং কাজের সময় ও পরিবেশে তারা কতটা ঝুঁকি ও নিপীড়নের মুখোমুখি হচ্ছে?
4. বর্তমান সামাজিক ও সরকারি উদ্যোগসমূহ কতটা কার্যকর, এবং পথশিশুদের পুনর্বাসন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোন ধরণের নতুন বা উন্নত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বিশেষ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রেক্ষাপটে?

সংক্ষেপে গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা :

* সাম্প্রতিক *UNICEF Bangladesh* রিপোর্টে দেখা গেছে, ৩.৪ মিলিয়ন শিশু “street situations”-এ রয়েছে এবং তাদের কথা শুনে কণ্ঠরোধ ও বঞ্চনা খুবই তীব্র; তাই শহরভিত্তিক বিস্তারিত অধ্যয়ন প্রয়োজন।
* A group of children sitting on a pile of sacks

  AI-generated content may be incorrect.“Survival Scenario of the Street Children in Bangladesh” নামের গবেষণায় পথশিশুদের ঝুঁকি ও স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান ও জীবনশৈলীর বিস্তারিত চিত্র পেয়েছে যা নির্দেশ করে যে কর্মজীবন ও নিরাপত্তার অবস্থা অনেক সময় সঙ্কীর্ণ ও বিপজ্জনক।

## ১.৫ গবেষণার গুরুত্ব

এই গবেষণার গুরুত্ব এখনকার সময় ও সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে আরও বহুমাত্রিক:

1. নীতিগত উন্নয়ন ও অধিকার বাস্তবায়ন:  
   সাম্প্রতিক “Children in Street Situations in Bangladesh ২০২৪” প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে ও সরকারের নীতি রয়েছে শিশুদের অধিকার রক্ষা করার জন্য। তবে পথশিশুদের দিক থেকে দেখা গেছে, শিক্ষা ও সুরক্ষা নীতিগুলো যথেষ্টভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না, যা নীতি ও পরিকল্পনায় ফাঁক রাখে। পথশিশুদের প্রকৃত জীবন ও অভিজ্ঞতা জানলে নীতিনির্ধারকদের জন্য কার্যকর সংশোধন ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হবে।
2. মানবিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার:  
   পথশিশুরা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও উপেক্ষিত গোষ্ঠীর অংশ; তাদের বিকাশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজের জন্যও মানবিক সংকট সৃষ্টি করে। “Life Style and Risk Behavior of Street Children in Bangladesh” গবেষণায় দেখেছে, ৮–১৪ বয়েসি বহু পথশিশু শারীরিক অথবা যৌন নির্যাতনের শিকার এবং প্রায় সকলেই বিভিন্ন রোগে ভুগছে। এই ধরনের বাস্তব চিত্র যদি নীতিপরিকল্পনায় উঠে আসে, সমাজের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজ হবে।
3. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার সুরক্ষা ঝুঁকি:  
   “A Case Study in Dhaka City” ২০২৫-এর গবেষণায় বলা হয়েছে, শহরের ব্যস্ত পরিবহন কেন্দ্রগুলোর আশেপাশে থাকা পথশিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় প্রবেশ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে—অনিয়মিত স্কুল যাওয়া, স্কুল ফি বা সময়ের অভাব, স্বাস্থ্যসেবায় সেবা পাওয়া ও ব্যয় এসব ক্ষেত্রে বড় বাধা। এই গবেষণা এই ধরনের অন্তরায়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে।
4. অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগঃ  
   দ্রুত নগরায়ণ এবং অভিবাসনের কারণে শহরগুলোর অনানুষ্ঠানিক বসতি বেড়েছে। পরিবার ভাঙ্গন, গৃহহীনতা, বদলি জীববৈচিত্র্য এসব বিষয় পথশিশুদের পথ-জীবনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। “Survival Scenario of the Street Children in Bangladesh” প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করেছেন যে, শুধু দারিদ্র্যই নয়, সামাজিক অবস্থা ও পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙ্গনও গুরুত্ব বহন করে।
5. বিচ্ছিন্ন বা অসম কর্মকর্তা ও সেবাদানকারীর অভাব:  
   গবেষণায় দেখা গেছে যে অনেক সময় সরকারি/বেসরকারি সেবা যেসব আছে, সেগুলো পথশিশুদের অভিব্যক্তি ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; তথ্য বা সংস্থান কম; প্রয়োজনে দ্রুত ও স্থানিক সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। “Development Policies for Street Children in Bangladesh” নামক গবেষণায় উল্লেখ আছে যে নীতিমালা তৈরিতে পথশিশুদের অন্তর্ভুক্তি কম এবং বাস্তব সেবা কম পাওয়া যাচ্ছে।
6. ভবিষ্যত প্রজন্ম ও টেকসই উন্নয়ন:  
   SDG (টেকসই উন্নয়ন উদ্দেশ্য) অনুযায়ী “কোনও শিশুকে পিছিয়ে পড়তে দেওয়া হবে না” এবং “মানসম্মত শিক্ষা এবং সামগ্রীক উন্নয়নে অংশগ্রহণ” এ ধরনের লক্ষ্যগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য পথশিশুদের অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ সূচক। পথশিশুরা যদি শিক্ষার সুযোগ পায়, স্বাস্থ্য সুরক্ষা পায় এবং হয়রানি থেকে রক্ষা পায়, তাহলে তারা সুস্থ ও দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে, যা সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

## ১.৬ গবেষণার যৌক্তিকতা :

১) সমস্যার ব্যাপকতা ও সময়োপযোগিতা  
সর্বশেষ মূল্যায়ন অনুযায়ী দেশে “রাস্তার পরিস্থিতিতে থাকা” শিশুদের সংখ্যা ৩.৪ মিলিয়নেরও বেশি—যাদের বড় অংশই পিতামাতার তাৎক্ষণিক তত্ত্বাবধানের বাইরে। এই পরিমাণ দেখায় যে পথশিশু ইস্যু কেবল স্থানীয় নয়, বরং জাতীয় পর্যায়ের একটি গুরুতর শিশু-সুরক্ষা সংকট; তাই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) ফোকাসড গবেষণা এখনই জরুরি।

২) হালনাগাদ নগর-প্রেক্ষাপট (ডিএসসিসি) ভিত্তিক ঘাটতি  
পূর্ববর্তী জাতীয়/শহরভিত্তিক গবেষণাগুলোতে পথশিশুর প্রক্ষেপণ ও সংখ্যা থাকলেও (যেমন ২০০৫ সালের বেসলাইন), ডিএসসিসির ওয়ার্ড/হটস্পট-লেভেল জীবনযাত্রা, কাজের ধরন, সেবা-প্রবেশ, সহিংসতা এক্সপোজার—এসব বিষয়ে সাম্প্রতিক, সূক্ষ্ম, প্রমাণভিত্তিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এই গবেষণা সে শূন্যস্থান পূরণে নিবিড় মাঠতথ্য দেবে।

৩) স্বাস্থ্য–শিক্ষা বৈষম্য ও উচ্চ ঝুঁকির প্রমাণ  
ঢাকার ব্যস্ত পরিবহন হাবগুলিতে (যেমন কমলাপুর, সায়েদাবাদ, সদরঘাট) থাকা পথশিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় প্রবেশ সীমিত; অনিয়মিত স্কুল-অংশগ্রহণ, ড্রপআউট এবং সাধারণ রোগে উচ্চমাত্রায় আক্রান্ত হওয়া—এসব সাম্প্রতিক ক্ষেত্রসমীক্ষায় উঠে এসেছে। কাজেই ডিএসসিসি এলাকায় লক্ষ্যভিত্তিক সমাধান তৈরিতে নতুন প্রমাণ দরকার।

৪) স্লাম/অনানুষ্ঠানিক বসতি–সংযুক্ত ঝুঁকির ক্লাস্টার  
ঢাকার নগর স্লামগুলো—এর মধ্যে শায়মপুর ও ধলপুর ডিএসসিসির অধীনে—উচ্চ স্বাস্থ্য–দুর্বলতা ও সামাজিক বঞ্চনার স্থায়ী ক্লাস্টার হিসেবে চিহ্নিত। এই ক্লাস্টারগুলোতে পথশিশুদের বসবাস/কর্মস্থল-নিকটতা বেশি; ফলে এলাকাভিত্তিক (place-based) নীতির যৌক্তিকতা শক্তিশালী।

৫) শিশুশ্রম ও বিপজ্জনক কাজে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা  
শিশুশ্রমের সাম্প্রতিক প্রবণতায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত শিশুদের উপস্থিতি উদ্বেগজনক; লম্বা সময় কাজ, স্বাস্থ্য-ঝুঁকি ও শোষণের প্রমাণ আছে—যা পথশিশুদের বাস্তবতায় আরও তীব্র হতে পারে। ফলে আয়ের উৎস, কাজের সময়, কর্মঝুঁকি—এসবের আপডেটেড মানচিত্র জরুরি।

৬) জলবায়ু ও দুর্যোগজনিত ধাক্কা—শিশুদের নতুন ঝুঁকি  
২০১৪–২০২৫ জুড়ে ঘনঘন বন্যা/ঘূর্ণিঝড় নগর দরিদ্র পরিবারকে বারবার বাস্তুচ্যুত করছে; এতে শিশুদের স্কুলছুটি দীর্ঘ হয়, কাজের বাজারে ঠেলে দেয়, এবং রাস্তায় বসবাস/কর্মের দিকে ঠেলে দেয়ার ঝুঁকি বাড়ায়—যা ডিএসসিসি এলাকায়ও প্রযোজ্য। তাই দুর্যোগ-সংবেদনশীল নকশা প্রয়োজন।

৭) নীতি–কর্মসূচির ‘লাস্ট-মাইল’ বাস্তবায়নে প্রমাণের চাহিদা  
শিশু সুরক্ষা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য–সেবায় নীতি থাকলেও, “শেষ মাইল” বাস্তবায়নে ওয়ার্ড/হটস্পট টার্গেটিং, কেস-ম্যানেজমেন্ট, মোবাইল শিক্ষা/স্বাস্থ্য ইউনিট, নিরাপদ আশ্রয়—এসব নিয়ে কার্যকারিতার প্রমাণ সীমিত। বর্তমান গবেষণা মাঠতথ্য দিয়ে কোন হস্তক্ষেপ কোথায় সবচেয়ে ফলদায়ক—তার প্রায়োগিক সুপারিশ দেবে।

৮) পরিমাপযোগ্য ফলাফল–সূচকে নীতি-সংযোগের সক্ষমতা  
গবেষণাটি শুরু থেকেই পরিমাপযোগ্য সূচক (শিক্ষায় অংশগ্রহণ/ড্রপআউট, সাম্প্রতিক অসুস্থতা, অপুষ্টি সূচক, কাজের ঘণ্টা, সহিংসতা এক্সপোজার, সেবা-গ্রহণ, পুনর্বাসন রিটেনশন ইত্যাদি) নির্ধারণ করে ফলাফলভিত্তিক সুপারিশ প্রদান করবে—যা ডিএসসিসি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিকল্পনায় সরাসরি প্রয়োগযোগ্য।

# অধ্যায় ২: পটভূমি ও সাহিত্য পর্যালোচনা

## ২.১ পটভূমি পথশিশু শব্দের ধারণা

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে “পথশিশু” বলতে এমন শিশুদের বোঝায় যারা জীবনের অধিকাংশ সময় রাস্তায় কাটায়। ইউনিসেফ বাংলাদেশের সংজ্ঞা অনুযায়ী, পথশিশু হলো সেই সব ছেলে-মেয়ে যারা সারাদিন রাস্তার নানা কাজে ব্যস্ত থাকে এবং রাতে পরিবারের কাছে ফিরে ঘুমাতে যায় – এদের বলা হয় *street children on the street*। অপরদিকে যারা সম্পূর্ণভাবে রাস্তার ওপর নির্ভরশীল – দিনরাত রাস্তাতেই কাজ, খাওয়া ও ঘুমায় – তারা হলো *street children of the street*। সাধারণত এরা কোনো প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবকের তত্ত্বাবধান ছাড়াই রাস্তা ও খোলা জায়গাকে নিজেদের আবাস বা জীবিকার উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বাংলায় এদেরকে “পথশিশু” বলা হলেও শহুরে কথ্যভাষায় “টোকাই” নামে ডাকা হয়, যার অর্থ আবর্জনা কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহকারী শিশু। যদিও “টোকাই” শব্দটি মূলত আবর্জনা সংগ্রহকারী শিশুদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, বাস্তবে পথশিশুরা নানা ধরণের কাজ করে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাস্তায় বাস করে।

### বাংলাদেশে শহরায়ণ ও দারিদ্র্যের প্রেক্ষিত

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে দ্রুত নগরায়ণ ঘটছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করছে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে এই হার প্রায় ৫০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এই নগরায়ণের সাথে সাথে শহুরে দারিদ্র্য ও বস্তিবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আনুমানিকভাবে শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ বস্তি বা অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বাস করছে যেখানে মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। পর্যাপ্ত বাসস্থান, আয় ও কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ জীবিকার সন্ধানে শহরে এসে বস্তিতে আশ্রয় নিচ্ছে। এসব অভিবাসী পরিবারের বহু শিশু চরম দারিদ্র্য, অসম্পূর্ণ পরিবার বা নির্যাতনের শিকার হয়ে অবশেষে রাস্তায় বসবাস শুরু করছে।

### পথশিশু সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকেই বাংলাদেশে অনাথ ও নিরাশ্রয় শিশুদের রাস্তার জীবনে দেখা যেত। তবে আশির ও নব্বইয়ের দশকে শহরায়ণ ও গ্রামীণ দারিদ্র্যের কারণে এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব থাকলেও বিভিন্ন সময়ের জরিপে সমস্যাটির বিস্তৃতি ধরা পড়েছে। ২০০১ সালে একটি সমীক্ষায় দেখা যায় দেশে প্রায় ৪.৪৫ লাখ পথশিশু রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশই ঢাকায় কেন্দ্রীভূত। ২০০৩ সালের আরেক জরিপে প্রধান শহরগুলোতে প্রায় পাঁচ লাখ পথশিশুর অস্তিত্ব চিহ্নিত করা হয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর প্রতিবেদনে অনুমান করা হয় যে দেশে প্রায় ১৫ লাখ পথশিশু রয়েছে এবং কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে ২০২৪ সালের মধ্যে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে গত কয়েক দশকে পথশিশু সমস্যা ক্রমেই তীব্রতর হয়েছে।

### পথশিশু সমস্যার সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩৪ লাখেরও বেশি শিশু বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধান ছাড়া রাস্তার পরিবেশে বসবাস করছে। পথশিশুদের বড় অংশই রাজধানী ঢাকায় কেন্দ্রীভূত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জরিপ অনুযায়ী, সর্বাধিক পথশিশু রয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় (২২.৭ শতাংশ), এরপর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (১৮.৩ শতাংশ)। অর্থাৎ শুধুই ঢাকায় দেশের মোট পথশিশুর প্রায় ৪১ শতাংশ অবস্থান করছে। এরা প্রধানত রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট, বাজার এলাকা ও পার্কে অবস্থান করে এবং জীবিকার তাগিদে নানা কাজে জড়িয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে পথশিশু সমস্যা এখন নগর দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তার একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ, যা সমাধানে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ অপরিহার্য।

## ২.২ সাহিত্য পর্যালোচনা

### পূর্ববর্তী গবেষণার ফলাফল (বাংলাদেশ)

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পথশিশুর সংখ্যা ও সমস্যার মূল কারণ প্রধানত দারিদ্র্য ও পরিবারিক ভাঙন। বিআইডিএস-এর গবেষণায় ২০১৫ সালে প্রায় ১৫ লাখ পথশিশুর তথ্য উঠে আসে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জরিপে দেখা যায়, পথশিশুদের ৮২ শতাংশ ছেলে এবং ১৮ শতাংশ মেয়ে। অনেক শিশু মাত্র ৮-১২ বছর বয়সেই জীবিকার তাগিদে কাজ শুরু করে। পরিবারগুলো এতটাই দরিদ্র যে তাদের দৈনন্দিন খাবার জোগাড় করতেও হিমশিম খেতে হয়, ফলে শিশুরা অল্প বয়সেই রাস্তায় নেমে আসে।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, প্রায় ৩৭ শতাংশ শিশু চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কারণে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসেছে। কেউ কেউ বাবা-মায়ের অকালমৃত্যু, পারিবারিক নির্যাতন বা কলহের কারণে রাস্তায় নেমেছে। অনেক শিশু অভিভাবকের কাজের সন্ধানে শহরে অভিবাসনের ফলে বা নিজেরাই কাজের খোঁজে শহরে এসে পথশিশুতে পরিণত হয়েছে।

### পথশিশুদের জীবনযাত্রা ও ঝুঁকি

পথশিশুরা সমাজের অন্যতম অবহেলিত জনগোষ্ঠী। এরা ক্ষুধা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চনা এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। বহু গবেষণায় দেখা গেছে, এসব শিশু যৌন নির্যাতন, শারীরিক সহিংসতা, শিশু পাচার ও মাদকাসক্তির মতো ঝুঁকির মধ্যে বড় হয়। বিশেষ করে কিশোরী পথশিশুরা যৌন নিপীড়ন ও পাচারের ঝুঁকিতে সবচেয়ে বেশি থাকে।

পথশিশুরা টিকে থাকার জন্য নানা ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়ে। যেমন: আবর্জনা কুড়ানো, হোটেল-রেস্তোরাঁয় কাজ, বাসের হেলপার, ভ্যানচালক, কুলি, ভ্রাম্যমাণ হকারি ইত্যাদি। এর অনেকগুলোই শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। অনেক শিশু মাদকদ্রব্য বহন বা ছোটখাটো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডেও জড়িয়ে পড়ে, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

পথশিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও গুরুতর। জরিপে দেখা গেছে, এদের অধিকাংশই জ্বর, কাশি, চর্মরোগ, পেটের রোগ ও শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়। সঠিক চিকিৎসার সুযোগ না থাকায় রোগগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব ফেলে।

### আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

পথশিশু কোনো এক দেশের সমস্যা নয়, বরং এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০ কোটি শিশু রাস্তাকেন্দ্রিক জীবনযাপন করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ পথশিশু পুরোপুরি অনাথ নয়; অনেকেই পরিবারের সাথে আংশিক যোগাযোগ রাখে। তবে পরিবারিক নির্যাতন ও সহিংসতা শিশুদের রাস্তায় ঠেলে দেয়। বিশ্বব্যাপী ছেলেশিশুর সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় বেশি, যদিও মেয়েশিশুরা একবার রাস্তায় এলে যৌন শোষণ ও পাচারের ঝুঁকিতে বেশি পড়ে।

### সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব অনুযায়ী, পথশিশু সমস্যা হলো সমাজের কাঠামোগত বৈষম্যের প্রতিফলন। কার্যনীতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, পরিবার, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যর্থ হলে শিশুরা রাস্তায় ঠেলে পড়ে। সংঘর্ষতত্ত্ব অনুসারে, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য এবং সম্পদের অসম বণ্টনের কারণেই পথশিশু সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক বর্জন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, পথশিশুরা মূলধারার সমাজ থেকে বঞ্চিত একটি গোষ্ঠী, যাদেরকে প্রায়শই নেতিবাচক লেবেল দেওয়া হয়।

### আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থার কার্যক্রম

ইউনিসেফ, আইএলও, বিআইডিএস ও সেভ দ্য চিলড্রেনসহ বিভিন্ন সংস্থা পথশিশু সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। ইউনিসেফের গবেষণা অনুযায়ী, পথশিশুরা দেশের সবচেয়ে উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী। আইএলও-এর তথ্য বলছে, বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করা সম্ভব নয় যদি পথশিশুদের অবস্থা উন্নত না হয়। সরকার সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যেমন শেখ রাসেল শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র। কিছু এনজিও রাত্রীকালীন আশ্রয়কেন্দ্র ও ড্রপ-ইন সেন্টার চালাচ্ছে। তবে এগুলো এখনও পর্যাপ্ত নয়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ বাংলাদেশের নগরীগুলোতে পথশিশু সমস্যা একটি গভীর সামাজিক চ্যালেঞ্জ। দ্রুত নগরায়ণ, গ্রামীণ দারিদ্র্য, পরিবার ভাঙন ও সামাজিক বৈষম্য এই সমস্যার মূল চালক। বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপে দেখা যায় যে পথশিশুরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শিক্ষাবঞ্চনা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে এবং অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ইউনিসেফ, আইএলও, সেভ দ্য চিলড্রেন প্রভৃতি সংস্থার তথ্য ও বিশ্লেষণ দেখায় যে এই সমস্যার সমাধানে বহুমুখী পদক্ষেপ প্রয়োজন – নিরাপদ আশ্রয়, পুনর্বাসন, শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, পরিবারভিত্তিক সুরক্ষা ও দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্য নিরসন। সমাজতাত্ত্বিকভাবে পথশিশু সমস্যা আসলে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ত্রুটির প্রতিফলন। তাই সফল সমাধানের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে এই শিশুরা মূলধারায় ফিরে এসে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

### কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে পথশিশুদের অবস্থা

কোভিড-১৯ মহামারির ধাক্কায় বাংলাদেশের পথশিশুরা চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। ২০২০ সালের লকডাউন ও নিষেধাজ্ঞার সময় বহু পথশিশু অনাহারে দিন কাটিয়েছে; জনজীবন স্থবির থাকায় এদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। গবেষণায় উঠে এসেছে, মহামারির কারণে শতকরা ৮৩.৮ ভাগ পথশিশুই মারাত্মক বিপাকে পড়ে, যাদের মধ্যে ৮৫.৭% খাদ্যসংকটে ভুগেছে, ৭৭% চাকরি/আয় হারিয়েছে এবং ৫৩.১% আশ্রয় হারানোর মতো দুরবস্থার শিকার হয়েছে। ঢাকা শহরের রাস্তায় বসবাসরত বহু শিশু লকডাউনে অনাহারে কাটিয়েছে; কারও কারও পুরো দিন কেটেছে এক গ্লাস পানি খেয়ে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS) এর পূর্বানুমান অনুযায়ী ২০১৫ সালে দেশে পথশিশুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ লাখ এবং ২০২৪ সালে তা বেড়ে ১৬ লাখে পৌঁছাবে। কিন্তু সাম্প্রতিক একটি গবেষণা ইঙ্গিত করছে যে বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে; ২০২৪ সালের এক সমীক্ষায় দেশের পথশিশুর সংখ্যা ৩৪ লাখ পর্যন্ত হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহামারির পরে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য ও পারিবারিক বিভ্রাট বেড়ে যাওয়ায় অনেক শিশু রাস্তায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষ করে পরিবারে অভিভাবকদের মৃত্যু, চাকরি হারানো কিংবা বিবাহবিচ্ছেদের ফলে শিশুদের একটি অংশ রাস্তায় ঠাঁই পেয়েছে। সর্বোপরি, কোভিড-পরবর্তী সময়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) এলাকাসহ শহরগুলোতে পথশিশুর সংকট আরও প্রকট হয়েছে।

পথশিশুরা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কর্মসূচিতেও উপেক্ষিত থেকে গেছে। সরকার ৫-১৮ বছর বয়সী স্কুলশিক্ষার্থীদের জন্য টিকা কার্যক্রম চালু করলেও জন্মনিবন্ধন সনদ না থাকায় অধিকাংশ পথশিশু টিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর শিশু সুরক্ষা বিভাগের পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, এসব শিশুর অভিভাবক না থাকায় তাদের জন্মনিবন্ধনও থাকে না, ফলে তারা সরকারিভাবে টিকাদানের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বিশেষজ্ঞরা পথশিশুদের তালিকা করে ফিংগারপ্রিন্টের মাধ্যমে টিকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। কোভিড পরবর্তীতে এমন উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা উঠেও এসেছে, কেননা স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষায় পথশিশুরা সবসময় প্রান্তিক অবস্থানে থাকে।

### মনোসামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

পথশিশুদের জীবনযাপন কেবল আর্থিক অনটনই নয়, মারাত্মক মানসিক ও মনোসামাজিক চাপও সৃষ্টি করে। কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রামরত এসব শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য নাজুক হয়ে পড়ে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপের কারণে পথশিশুদের মধ্যে ৬৭.৫% শিশুই হতাশা ও অবসাদে ভুগছে। এই হতাশার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অনাথ হওয়া (১৫.৬%), খাবার জোটাতে না পারা (১৩.৮%), এবং নিয়মিত মৌখিক নির্যাতনের শিকার হওয়া (১৩.৯%) উল্লেখযোগ্য। নিজেদের হতাশা দূর করতে প্রায় ৩৫% শিশু চুপচাপ কোনো কোণে বসে থাকে, আর প্রায় ১০% শিশু মাদক সেবন করে অথবা ধূমপানে আশ্রয় খোঁজে। বাস্তবে অনেক পথশিশুই রাতে ঘুমাতে না পারার কথা জানায়; তাদের ৩৬.৪% বলেছে পুলিশ বা নিরাপত্তাকর্মীরা জাগিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, আবার অনেকের ঘুম ভাঙে অসহ্য গরম, মশার কামড় কিংবা অনাহারের যন্ত্রণায়। ফলে শারীরিক ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে মানসিকভাবেও তারা বিপর্যস্ত থাকে।

মাদকাসক্তি পথশিশুদের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা এবং এটি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে আরও বিপর্যস্ত করে তোলে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক জরিপে দেখা গেছে, পথশিশুদের ৫৬% কোনো না কোনো মাদকে আসক্ত এবং ২১% শিশু মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু মাত্র ১০ বছর বয়স থেকেই মাদক গ্রহণ শুরু করেছে। “ড্যান্ডি” নামে আঠা (গাম) শুঁকে নেশা করা পথশিশুদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়, কারণ এটি সহজলভ্য ও সস্তা এবং এজন্য আইনগত জটিলতাও কম। জরিপে আরও উঠে এসেছে, পথশিশুদের প্রায় ৬০% প্রতিদিন কোনো না কোনো মাদক নেয়। এসব মাদকাসক্তির কারণে ৫৫% শিশুর মানসিক অবস্থা খারাপ এবং ৬৪% নিজের ওপর সংযম হারিয়ে ফেলে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে দীর্ঘ একাকিত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অনেক শিশুকে দ্রব্যাসক্তির দিকে ঠেলে দেয়। মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বন্ধুবান্ধব বা পরিবারবিহীন এসব শিশুরা একাকিত্ব দূর করতে আঠা শুঁকে কিংবা অন্যান্য নেশায় মেতে ওঠে। উন্নয়ন সংস্থা লীডো (LEEDO)-এর প্রতিষ্ঠাতা ফরহাদ হোসেন উল্লেখ করেন যে, মহামারির ধাক্কায় পথশিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং নেশাগ্রস্ত অনেক শিশুই স্বাভাবিকভাবে অন্যদের সাথে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া রাস্তার জীবনে নিত্যদিনের সহিংসতা, নির্যাতন আর অনিশ্চয়তা এসব শিশুর মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে, যার ফলস্বরূপ অনেকের মাঝেই ভয়, উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে।

### প্রযুক্তির সাথে পথশিশুদের সম্পর্ক

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ডিজিটাল উন্নয়নের বিপরীতে পথশিশুরা রয়ে গেছে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বাইরে। ডিজিটাল বৈষম্য এতটাই স্পষ্ট যে করোনাকালে স্কুল বন্ধের সময় অনলাইনে বা টেলিভিশনে বিকল্প শিক্ষায় দেশের মাত্র ১৮.৭% শিশু অংশ নিতে পেরেছিল। গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারে জন্মানো শিশুদের বড় অংশেরই ইন্টারনেট বা টিভি ছিল না, ফলে তারা দূরশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়। পথশিশুদের অবস্থা আরও করুণ; ঘরবাড়িহীন এসব শিশুদের কাছে ইন্টারনেট তো দূরের কথা, বিদ্যুৎ চালিত কোনো ডিভাইসই নেই। ইউনিসেফ ও আইটিইউ-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে বাংলাদেশে দরিদ্রতম ২০% পরিবারের মাত্র ৮.৭% ইন্টারনেট সুবিধা পায়, বিপরীতে শীর্ষ ধনী ২০% পরিবারের ৭৫.৩% ইন্টারনেট ব্যবহার করে। সুতরাং সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক এই পথশিশুরা কার্যত ডিজিটাল দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মহামারির সময়ে ইন্টারনেট বা টিভি সুবিধা না থাকায় পড়ালেখা তাদের জন্য একপ্রকার অকল্পনীয় হয়ে পড়ে; অনলাইনে ক্লাস করা বা টেলিশিক্ষার সুযোগ এদের ভাগ্যে জোটেনি। এর ফলে যে শিক্ষাগত ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

প্রযুক্তিগত সুবিধা না থাকায় একদিকে যেমন শিক্ষা ও তথ্য থেকে পথশিশুরা বঞ্চিত, অন্যদিকে আধুনিক সেবা পাওয়াতেও তারা পিছিয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, কোভিড টিকাদানে ডিজিটাল নিবন্ধন দরকার হওয়ায় জন্মসনদবিহীন এসব শিশুরা সহজে টিকা পায়নি। আবার ডিজিটাল জন্মনিবন্ধন ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে সকল শিশুকে পরিচয়পত্র দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে; ইউনিসেফের সহায়তায় সরকারের ডিজিটাল সিভিল রেজিস্ট্রেশন অভিযানে ২০২২ সালে এক বছরে ২.৩ কোটি মানুষকে নিবন্ধিত করা হয়েছে এবং জাতীয় জন্মনিবন্ধন ক্যাম্পেইনে প্রায় ৭ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছানো হয়েছে। এই উদ্যোগগুলো সফল হলে ভবিষ্যতে পথশিশুরা পরিচয়পত্র পেতে পারে, যা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সেবার আওতায় আনতে সহায়ক হবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে মোবাইল নিবন্ধন ক্যাম্পেইন চালুরও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে বস্তি ও রাস্তার শিশুরাও আইডি পায়। এছাড়া কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রযুক্তি ব্যবহার করে পথশিশুদের সাহায্য করার উদ্যোগ নিয়েছে; যেমন, রাতে আশ্রয়ের জন্য হেল্পলাইনে যোগাযোগ স্থাপন বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অবস্থান জানিয়ে সহায়তা চাওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। তবে সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রযুক্তির ইতিবাচক সুবিধাগুলো এখনো পথশিশুদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথেও ওরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী।

### পুনর্বাসন কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা

পথশিশু পুনর্বাসনে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা কিছু উদ্যোগ নিলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং নানা সীমাবদ্ধতায় জর্জরিত। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকার ২০১৬ সাল থেকে দু’টি শিশুপুনর্বাসন কেন্দ্র চালু করেছে – একটি কমলাপুরে (প্রধানত মেয়ে শিশুদের জন্য) এবং অন্যটি কারওয়ান বাজারে (ছেলে শিশুদের জন্য)। তবে এই কেন্দ্রগুলোর ধারণক্ষমতা খুব সীমিত (একেকটি কেন্দ্রে অল্প কয়েকজন – যেমন কমলাপুর কেন্দ্রে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মাত্র ৭১ জন শিশু দুপুরের খাবারের অপেক্ষায় ছিল) এবং সেখানে প্রদত্ত সেবার মানও প্রশ্নবিদ্ধ। অনুসন্ধানে বেরিয়েছে যে এই দুটি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে খাবারের মান অত্যন্ত নিম্নমানের – শিশুদের প্লেটে মাংসের বদলে মুরগির পা ও আলু বেশি দেওয়া হচ্ছিল, অথচ বিল করা হচ্ছিল নামকাওয়াস্তে কিছু অস্তিত্ববিহীন রেস্তোরাঁর নামে। দুর্নীতির এমন অভিযোগে ২০২২ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন পর্যন্ত তদন্ত চালিয়েছে। অর্থাৎ, পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ থাকলেও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময় নিশ্চিত হয়নি। এছাড়া দক্ষ জনবলের অভাব, স্বচ্ছতা সংকট ও নজরদারির দুর্বলতায় এই কেন্দ্রগুলোর কার্যকারিতা সীমিত হয়ে পড়েছে।

পথশিশুদের পুনর্বাসনে অনীহার কারণ সম্পর্কিত এক সাম্প্রতিক গবেষণা (মৌ ও ইসলাম, ২০২৪) বলছে, রাস্তার জীবনের সাথে শিশুদের যে মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে সেটিই তাদের পুনর্বাসনকেন্দ্র থেকে দূরে রাখে। এই গবেষণায় “পুশ ফ্যাক্টর” ও “পুল ফ্যাক্টর” তত্ত্বের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুশ ফ্যাক্টর বা যে কারণগুলোর জন্য শিশু রাস্তায় আসে সেগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য, পারিবারিক ভাঙন, শারীরিক/মানসিক নির্যাতন, মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকা, শিশুশ্রম ও শোষণ প্রধান। আবার পুল ফ্যাক্টর তথা যে আকর্ষণ বা প্রতিকূলতার জন্য তারা পুনর্বাসনকেন্দ্রে যেতে চায় না তার মধ্যে সমবয়সী বন্ধুদের প্রভাব, মাদকাসক্তি, স্বাধীনতা হারানোর ভয়, আর কিছু পুনর্বাসনকেন্দ্রে পাওয়া দুর্ব্যবহার বা নিগ্রহের আশঙ্কা উল্লেখযোগ্য। অনেক শিশু রাস্তার জীবনে অন্তত কিছু স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুভব করে; পুনর্বাসনকেন্দ্রের নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে সেই স্বাধীনতা হারিয়ে যাবে বলে তাদের ভয় রয়েছে।

বসবাসরত পথশিশুদের বড় অংশই আসলে পুনর্বাসন সেবার আওতায় আসে না বা আসতে চায় না। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) একটি জরিপে দেখা গেছে, পথশিশুদের ৮৪.৫% পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্পর্কে জানেই না, এবং যেসব শিশুরা এ ধরনের কেন্দ্রের কথা শুনেছে তাদের মধ্যে প্রায় ৭২% সেখানে যেতে আগ্রহী নয়। এ পরিসংখ্যান দেখায় যে সরকারি বা বেসরকারি পুনর্বাসন উদ্যোগগুলো লক্ষ্যগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারছে না বা আস্থার সংকট রয়েছে। পুনর্বাসনকেন্দ্রগুলোর পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনাও অনেক শিশুকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে – যেমন কিছু কেন্দ্রে ভয় বা হয়রানির অভিজ্ঞতার কথা বিভিন্ন বর্ণনায় উঠে এসেছে।

তবে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগও লক্ষ্য করা যায়। ইউনিসেফের সহায়তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় তিনটি “চাইল্ড প্রোটেকশন সার্ভিস হাব” বা শিশুরক্ষা সেবা কেন্দ্র চালু করেছে, যা ত্রাণশিবিরের মতো করে পথশিশুদের রাত্রিকালীন আশ্রয়, খাবার, মৌলিক চিকিৎসা, বিনোদন এবং মনোসামাজিক কাউন্সেলিং দিচ্ছে। ২০২২ সালে এই কেন্দ্রগুলো প্রায় ২৯২৪ জন পথশিশুকে সেবা দিয়েছে, যার মধ্যে ১১২ জন শিশুকে তাদের পরিবারে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়েছে। একই সাথে ৩২ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মী ঢাকা শহরের ৬৬টি হটস্পটের মধ্যে ৮টি এলাকায় মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করেছেন এবং মাত্র তিন মাসে ৫০০০-এর বেশি পথশিশুর কাছে পৌঁছেছেন। এই ধরনের সক্রিয় তৎপরতা পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় নতুন আশার সঞ্চার করছে, যদিও মোট সমস্যার তুলনায় এ উদ্যোগ এখনো অপ্রতুল আকারে রয়েছে।

বেসরকারি সংগঠনগুলোও পথশিশু উদ্ধার ও পুনর্বাসনে ভূমিকা রাখছে। উদাহরণস্বরূপ, Local Education and Economic Development Organization (LEEDO) নামক এনজিও গত দুই বছরে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৭০০ পথশিশুকে উদ্ধার করে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে বলে জানিয়েছে। এদের বেশিরভাগই ভাঙা পরিবার থেকে আসা শিশু, যাদের অনেকে পরবর্তীতে পরিবারের সাথেও পুনর্মিলিত হয়েছে। এছাড়া অপরাজেয় বাংলাদেশ, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ব্র্যাক, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর মতো সংস্থাগুলো শিক্ষা কেন্দ্র, ড্রপ-ইন সেন্টার, রাত্রিকালীন আশ্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে যা কিছু শিশুর জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। তবে এসব প্রচেষ্টার পরিসর সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পনির্ভর, যা দীর্ঘমেয়াদে স্থায়িত্বহীন হয়ে পড়ে।

নীতিগত দিক থেকে বলতে গেলে, বাংলাদেশে পথশিশুদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে সরাসরি লক্ষ্যভিত্তিক আইন বা নীতি নেই। যদিও শিশুর অধিকার রক্ষায় ২৫টির বেশি আইন ও বিধি রয়েছে, যেমন শিশু আইন ২০১৩, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ ইত্যাদি, তবে কোনোটাই স্পষ্টভাবে পথশিশু নিয়ে দিকনির্দেশনা দেয় না। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পথশিশুদের নিয়ে একটি ভিত্তিস্বরূপ জরিপ পরিচালনা ও পুনর্বাসনের নির্দেশনা দেওয়া হয় এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে “পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম” শুরু হয়। কিন্তু এ প্রকল্পের বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, বাজেট ব্যয়ের অনিয়ম এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ঘাটতির কারণে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পথশিশু সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিসর ও অঙ্গীকার আরও বাড়াতে হবে। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর কর্মকর্তার ভাষায়, “হাজার কোটি টাকার মেগা উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে শহর সাজানো হলেও যদি রাস্তার শিশুরা উপেক্ষিত থাকে তাহলে সেই উন্নয়ন প্রশ্নবিদ্ধ থেকেই যাবে”। পথশিশুদের নিজের পরিবারের মত করেই রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে; রাষ্ট্রীয়ভাবে এই শিশুদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের দায়িত্বভার না নিলে ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রাও অর্জন সম্ভব নয়। আশার কথা, সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পথশিশুদের অধিকার রক্ষায় ও তাদের জীবনের মানোন্নয়নে একটি বড় “মেগা প্রকল্প” হাতে নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। এই প্রকল্পটি শীঘ্রই শুরু হবে বলে সরকারি কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেছেন, যা যদি বাস্তবায়িত হয় তবে হয়তো পথশিশু ইস্যুতে দৃশ্যমান পরিবর্তন আসতে পারে।

### পথশিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও বাধাসমূহ

শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা পথশিশুদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি ও লিঙ্গসমতা সূচকে অগ্রগতি সত্ত্বেও এই শিশুরা কার্যত সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার বাইরে রয়ে গেছে। গবেষণা বলছে, ঢাকা ও বরিশালের রাস্তার সাথে সংযুক্ত ৯৮.৫% শিশুই বর্তমানে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে না এবং তাদের অধিকাংশই বর্ণমালার একটি অক্ষরও লিখতে সক্ষম নয়। বিবিএসের ২০২২ সালের জরিপে অংশ নেওয়া পথশিশুদের মধ্যে যদিও ৬৪% জীবনে কোনো একসময় স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, বর্তমানে প্রায় ৯১% শিশু কোনো না কোনো শ্রমে নিযুক্ত এবং পড়াশোনার সুযোগ কিংবা সময় পাচ্ছে না। এই শিশুদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কখনোই স্কুলে যায়নি, আর যারা গিয়েছিল তাদেরও বড় অংশ টিকে থাকতে পারেনি।

পথশিশুদের শিক্ষাবিমুখ থাকার পেছনে বহুমাত্রিক বাধা কাজ করে। অর্থনৈতিক কারণ এতে প্রধান ভূমিকা রাখে – দিনমজুরির মতো দৈনিক আয়ের কাজ করেই অনেক পথশিশুকে নিজের জীবনধারণ করতে হয়, তাই উপার্জন বন্ধ রেখে নিয়মিত স্কুলে যাওয়াটা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউশন ফি না লাগলেও ইউনিফর্ম, উপকরণসহ নানা আনুষঙ্গিক খরচ এবং স্কুলে না গিয়ে কাজ না করলে উপার্জন হারানোর চাপ এসব শিশুদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে। সামাজিক কারণও আছে; কিছু পরিবার (যেমন যারা ফুটপাতে বা বস্তিতে থাকে) সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অনিচ্ছুক, কারণ তাদের দৃষ্টিতে পড়াশোনার চেয়ে জীবিকার তাগিদটাই বড়। অনেক শিশুই পড়ার সুযোগ পেলেও নিজে পড়ার চেয়ে কাজ করে টাকা রোজগার করাকে অগ্রাধিকার দেয়, বিশেষত যদি পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার ওপর থাকে। এক জরিপে দেখা গেছে, পথশিশুদের মধ্যে ৬৫.৭% শিক্ষার ব্যাপারে নিজেদের মনোভাব নিয়ে কথা বলতে চায়নি – যা ইঙ্গিত করে যে শিক্ষাটা তাদের কাছে কতটা অপ্রাসঙ্গিক বা কম অগ্রাধিকারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারির ধাক্কায় এসব শিশুদের শিক্ষা পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে। সরকার ও এনজিওগুলো যে অল্পকিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র (যেমন কমিউনিটি স্কুল, ড্রপ-ইন সেন্টার) পরিচালনা করতো, সেগুলো লকডাউনে বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন। কমলাপুর রেলস্টেশনে বসবাসরত এমনই এক কিশোর জানায়, সে এনজিও পরিচালিত একটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ছিল, কিন্তু মহামারির সময় কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গেলে তার পড়াশোনা থেমে যায় এবং পরে কেন্দ্র খুললেও তার আর আগ্রহ ফেরেনি। লকডাউনের দীর্ঘ বিরতিতে অনেক শিশুই পড়াশোনার অভ্যাস ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে; জরিপ মতে, আগে এনজিও স্কুলে পড়া বেশিরভাগ শিশুই পরে আর ক্লাসে ফিরে আসেনি। ফলস্বরূপ, মহামারির পরে পথশিশুদের শিক্ষাগত পিছিয়ে পড়া আরো বেড়েছে।

পথশিশুদের শিক্ষার পথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের বাধাই রয়েছে। অনেকের জন্মনিবন্ধন ও আইনি পরিচয়পত্র না থাকায় সরকারি স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়ায় জটিলতা হয়। পরিবেশগতভাবেও তারা বিদ্যালয়ে বৈষম্য ও হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার শিকার হতে পারে, যা স্কুল থেকে দূরে থাকার আরেক কারণ। উপরন্তু যাযাবর মতো শহরের এ প্রান্ত ও প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো, রাতে খোলা আকাশের নিচে অথবা বিভিন্ন স্থানে থাকার দরুণ নিয়মিত একটি স্কুলে উপস্থিত থাকা তাদের পক্ষে অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় এসব শিশুর অনেকে বাল্যকালেই শ্রমবাজারে প্রবেশ করে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ (যেমন ময়লা সংগ্রহ, ভিক্ষাবৃত্তি, পরিবহন শ্রম ইত্যাদি) করতে বাধ্য হয়। বিবিএস জরিপ অনুসারে পথশিশুদের প্রায় ২০% আবর্জনা সংগ্রহে জড়িত, ১৮% ভিক্ষাবৃত্তি বা ভিক্ষায় সহায়তা করে, ১৫% দোকান-হোটেল-চায়ের স্টলে কাজ করে। এই ধরনের শ্রমে নিযুক্ত থাকায় শিক্ষার সুযোগ তাদের জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

এপ্রেক্ষিতে পথশিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ দরকার বলে বিশেষজ্ঞরা মত দেন. মোশাররফ তানসেন (২০২৫) মত দিয়েছেন যে, সরকার ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের উচিত জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী শহরভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যেখানে পথশিশুদের শিক্ষার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি জোর দেন যে ঐতিহ্যবাহী শ্রেণিকক্ষে স্থির হয়ে পড়াশোনা করা এই শিশুদের জন্য কার্যকর নাও হতে পারে; বরং নমনীয় ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, মোবাইল স্কুল, মুক্ত আকাশের নিচে ক্লাস, ড্রপ-ইন শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি পথশিশুদের জন্য সেতুবন্ধনের কাজ করতে পারে। এসব উদ্যোগে প্রাথমিক সাক্ষরতা ও গণনাশিক্ষার পাশাপাশি জীবনদক্ষতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং প্রাথমিক আর্থিক শিক্ষা দিতে হবে যাতে শিশুরা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। কয়েকটি এনজিও (যেমন ব্র্যাক, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, লীডো) ইতোমধ্যে এ ধরনের অপ্রচলিত শিক্ষাকর্মসূচিতে ভালো ফল দেখিয়েছে, তবে বৃহত্তর পরিসরে সমন্বিত প্রয়াসের অভাবে এসব কার্যক্রমের প্রভাব সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। পথশিশু যারা বয়সে বড় (কিশোরাবস্থা পেরিয়েছে), তাদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রয়োজন, যাতে তারা ভবিষ্যতে আত্মকর্মসংস্থানে বা চাকরিতে যুক্ত হতে পারে। সরকার পরিচালিত স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের মতো প্রকল্পগুলোতে এসব প্রান্তিক যুবকদের অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হচ্ছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পথশিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। শহরের বস্তি, স্টেশন, টার্মিনাল ইত্যাদি পথশিশুদের বেশি সমাগম হয় যেসব এলাকায়, সেগুলো চিহ্নিত করে সেখানে স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টার বা পার্কের একাংশকে ব্যবহার করে “শিশু অঞ্চল” (Children’s Zone) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেখানে আবাসন, খেলার মাঠ ও অস্থায়ী স্কুল একত্রে থাকবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় যেমন বোগোটা ও ম্যানিলায় এ ধরনের মডেল সফল হয়েছে, ঢাকা শহরেও সেরূপ উদ্যোগ শহরের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে দেখা যেতে পারে। তাছাড়া পথশিশুদের জন্য বিশেষ “রাতের আশ্রয়কেন্দ্র” প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি, কারণ দিনের বেলা কিছু শেখার পরে রাতে যদি তারা সুরক্ষিত জায়গায় ঘুমাতে না পারে তবে শেখার আগ্রহ টিকে না থাকায় পরের দিন আবার রাস্তায় ফিরে যায়। সেভ দ্য চিলড্রেন ও অপরাজেয় বাংলাদেশ স্বল্প পরিসরে মেয়েদের জন্য রাতের আশ্রয়কেন্দ্র পাইলট করেছে অতীতে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত ছিল না। ডিএসসিসি’র উচিত নিজেদের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে এ ধরনের রাতে থাকার নিরাপদ ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা এবং এগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কর্মসূচির সাথে সংযুক্ত করা। এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, কাউন্সেলিং ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে যাতে শিশুরা মূল সমাজের সাথে ধাপে ধাপে সংযুক্ত হতে পারে।

উপরের পর্যালোচনায় উঠে আসে যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পথশিশুরা বহুমাত্রিক সংকটের মুখোমুখি। কোভিড-১৯ পরবর্তীকালে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা আরো ভঙ্গুর হয়েছে; খাদ্য ও বাসস্থানের অনিশ্চয়তা বেড়েছে এবং অনেক নতুন শিশু রাস্তায় এসে যুক্ত হয়েছে। এসব পথশিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত – দীর্ঘদিনের সহিংসতা, নির্যাতন, উপেক্ষা আর অনিশ্চয়তার জীবন তাদের মধ্যে হতাশা, উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে; বিপুল অংশ নানা নেশায় জড়িয়ে পড়েছে যা তাদের ভবিষ্যৎকে আরও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার সত্ত্বেও এই শিশুরা শিক্ষার ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা থেকে একপ্রকার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ফলে মহামারির সময় দূরশিক্ষণ বা অনলাইনে পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারাই ছিল সবচেয়ে পশ্চাৎপদ। সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা পথশিশু পুনর্বাসনে কিছু পদক্ষেপ নিলেও সেগুলোর আওতা ও গুণগত মান যথেষ্ট নয়। ডিএসসিসি এলাকাতেই পথশিশুর ঘনত্ব দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (২২.৭%), অথচ বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্র ও সেবা কার্যক্রম খুব সীমিত সংখ্যক শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারছে। অধিকাংশ পথশিশু এখনো পুনর্বাসন কাঠামোর বাইরে রয়ে গেছে এবং অনেকেই বিভিন্ন কারণে এসব সেবায় আকৃষ্ট হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে পিছিয়ে পড়া; দারিদ্র্য, পারিবারিক অবহেলা, কর্মচাপ ও সামাজিক বাধার কারণে বিদ্যালয় থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিদ্যমান গবেষণা ও প্রতিবেদনগুলো থেকে কয়েকটি সুপারিশ প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, পথশিশুদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকারে নিয়ে আসতে হবে – জন্মনিবন্ধনসহ আইনি পরিচয় নিশ্চিত করে এই শিশুদের সরকারিভাবে সেবা কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শহর পর্যায়ে বিশেষ করে ডিএসসিসি’র মত প্রতিষ্ঠানের উচিত স্থানীয়ভাবে পথশিশুর জন্য বাজেট বরাদ্দ, শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিত করে বিশেষ কর্মকৌশল গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, আশ্রয় ও পুনর্বাসনকেন্দ্রের সংখ্যা ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে, এবং সেগুলোর পরিবেশ শিশুবান্ধব ও নির্যাতনমুক্ত রাখতে হবে যাতে শিশুরা স্বেচ্ছায় সেখানে থাকতে আগ্রহী হয়। চতুর্থত, প্রচলিত শিক্ষার বাইরে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা (মোবাইল স্কুল, ড্রপ-ইন সেন্টার, রাতের বিদ্যালয়) প্রসার করে এসব শিশুকে সাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতা শেখাতে হবে। পঞ্চমত, মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি নিরসনে পথশিশুবান্ধব কাউন্সেলিং এবং পুনর্বাসন (ড্রাগ রিহ্যাব) প্রোগ্রাম চালু করা জরুরি। সর্বোপরি, সরকার, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিসেফ, সেভ দ্য চিলড্রেনসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ প্রয়োজন যাতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার পথশিশুরা ধীরে ধীরে মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারে। উপর্যুক্ত প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ ভবিষ্যৎ অধ্যয়ন ও নীতিনির্ধারণে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, যা এই প্রকল্পের পরবর্তী অধ্যায়গুলোর তত্ত্বীয় কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে সহায়ক হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে অর্জিত এই জ্ঞান গবেষককে ঢাকা দক্ষিণ সিটির পথশিশুদের পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য একটি দৃঢ় প্রেক্ষাপট প্রদান করবে এবং মাঠপর্যায়ের সমাজতাত্ত্বিক পরীক্ষার

## ২.৩ বাংলাদেশের পথশিশুদের জীবনমান: পূর্ববর্তী গবেষণা, ফাঁকসমূহ ও নতুন সংযোজন

বাংলাদেশে পথশিশুদের জীবনমান নিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যেমন ইউনিসেফ, বিআইডিএস, জাইকা, লিডো, সেভ দ্য চিলড্রেন) বহু গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। এসব পূর্ববর্তী গবেষণায় কোন বিষয়গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষিত হয়েছে এবং কোন দিকগুলো অপর্যাপ্তভাবে আলোচিত রয়েছে—তা নিচে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। পাশাপাশি বর্তমান গবেষণায় নতুন যে দিকগুলো যুক্ত হয়েছে সেগুলোরও বর্ণনা দেওয়া হলো।

পূর্ববর্তী গবেষণায় আলোচিত ও পর্যবেক্ষিত বিষয়সমূহ

১) সংখ্যাগত চিত্র ও পরিসংখ্যান

* প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণাগুলোতে দেশে পথশিশুর সংখ্যা, শহরভিত্তিক বণ্টন এবং সময়ক্রমে বৃদ্ধির প্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে।
* প্রক্ষেপণগুলোতে দেখা গেছে—নগরায়ণ, গ্রামীণ দারিদ্র্য ও অভিবাসনের চাপের কারণে মোট পথশিশুর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে/বাড়ছে।
* সাম্প্রতিক সরকারি-আন্তর্জাতিক সমীক্ষাগুলো (যৌথভাবে পরিচালিত) পথশিশু পরিস্থিতির বিস্তৃত চিত্র দেয়, তবে জাতীয় মোট সংখ্যা নির্ধারণে দীর্ঘদিন নির্ভরযোগ্য, নিয়মিত জরিপের ঘাটতি ছিল।

২) পথশিশু হওয়ার কারণ ও পারিপার্শ্বিকতা

* প্রধান চালক: চরম দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানের অভাব, পরিবার ভাঙন, পিতামাতার মৃত্যু/অনুপস্থিতি, গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিবাসন।
* উল্লেখযোগ্য অংশ কিশোর বয়সেই কাজের সন্ধানে বা নির্যাতন/সহিংসতা থেকে পালিয়ে রাস্তায় আশ্রয় নেয়।

৩) জীবনযাত্রার অবস্থা ও দৈনন্দিন সংগ্রাম

* নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব; অনেকেই ফুটপাত, স্টেশন, পার্ক বা বাজার চত্বরেই রাত কাটায়।
* খাবার, পরিষ্কার পানি, টয়লেট ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা—সব ক্ষেত্রেই তীব্র অনিশ্চয়তা।
* রাতে ঘুমের সময়ও চুরি, তাড়ানো, অপমান বা সহিংসতার ঝুঁকি রয়েছে।

৪) নিপীড়ন, সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতা

* পথচলতি মানুষ, গ্যাং, অপরাধচক্র কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ—সব মিলিয়ে শিশুদের ওপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।
* আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হয়রানির অভিজ্ঞতাও অনেক গবেষণায় উঠে এসেছে।

৫) শ্রম ও অর্থনৈতিক শোষণ

* টিকে থাকার জন্য অধিকাংশ পথশিশুই ঝুঁকিপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক কাজে জড়িত (বর্জ্য সংগ্রহ, চা-হোটেল/ওয়ার্কশপে কাজ, খুচরা বহন, ভিক্ষা ইত্যাদি)।
* কম বয়সে দীর্ঘ সময় শ্রম, অতি স্বল্প আয়, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা/আঘাত ও সহিংসতার অভিজ্ঞতা সাধারণ।
* আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (যেমন সঞ্চয়, হিসাব খোলা) নিয়ে কিছু পাইলট মডেল থাকলেও অধিকাংশ শিশু এসব সুবিধার বাইরে।

৬) স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিস্থিতি

* বৃহৎ অংশ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নেই; মৌলিক সাক্ষরতার ঘাটতি প্রকট।
* ঘনঘন জ্বর, কাশি, ডায়রিয়া, চর্মরোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ—প্রাথমিক স্বাস্থ্যসমস্যা ব্যাপক; নিয়মিত চিকিৎসা/পুষ্টি প্রায় অনুপস্থিত।
* নেশাজাতীয় দ্রব্যের সংস্পর্শ ও আসক্তির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য।

৭) সেবা ও সহায়তা সম্পর্কে সচেতনতা

* আশ্রয়কেন্দ্র, ডে-কেয়ার, ড্রপ-ইন সেন্টার, শিক্ষা/স্বাস্থ্যসেবা—এসবের অস্তিত্ব ও প্রাপ্তি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক শিশু অবহিত নয়।
* ফলে সেবায় প্রবেশাধিকার কম, আস্থা ও পৌঁছনোগম্যতায় বড় ফাঁক রয়ে যায়।

পূর্ববর্তী গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও প্রধান গবেষণাগত ফাঁক

১) নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য উপাত্তের ঘাটতি

* দীর্ঘদিন জাতীয় পর্যায়ে পথশিশু-নির্দিষ্ট, ধারাবাহিক জরিপের অভাব ছিল।
* অনেক অনুমানই ছিল প্রক্ষেপণনির্ভর; হালনাগাদ, সূক্ষ্ম ও এলাকা-ভিত্তিক সংখ্যাগত ছবির ঘাটতি নীতিনির্ধারণে বাধা হয়েছে।

২) মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক প্রভাবের উপেক্ষা

* অধিকাংশ গবেষণা খাদ্য-আশ্রয়-নিরাপত্তায় সীমিত; বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, ট্রমা/পিটিএসডি, আত্মসম্মানবোধ—এসব মানসিক সূচকে পরিমাপভিত্তিক বিশ্লেষণ ছিল বিরল।
* মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, কপিং-মেকানিজম, রেজিলিয়েন্স—এসব নিয়ে ডেটা অপ্রতুল।

৩) নগরভিত্তিক বিভাজন ও স্থানভিত্তিক বিশ্লেষণের অভাব

* মহানগরের ভেতরে অঞ্চলভেদে (যেমন ঢাকা দক্ষিণ বনাম ঢাকা উত্তর; স্টেশন-কেন্দ্রিক হটস্পট বনাম বস্তি পকেট) সমস্যা ও ঝুঁকির প্রকৃতি কীভাবে ভিন্ন—এ নিয়ে নিবিড় তুলনামূলক বিশ্লেষণ কম।

৪) ব্যবহারিক নীতিগত সুপারিশের স্বল্পতা

* সমস্যা সনাক্ত হলেও সুনির্দিষ্ট, বাস্তবায়নযোগ্য, বাজেট-সংবলিত, সময়রেখাসহ কর্মপন্থা প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল।
* স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) পর্যায়ে কার্যকর দায়-দায়িত্ব ও সমন্বয়-প্রক্রিয়া অনেক গবেষণায় অনির্দিষ্ট।

৫) পুনর্বাসন কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়নের ঘাটতি

* সরকারি/এনজিও আশ্রয়কেন্দ্র, ড্রপ-ইন সেন্টার, পরিবার-পুনর্মিলন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ—এসবের দীর্ঘমেয়াদি ফল (রিটেনশন, স্কুলে ফেরা, পুনরায় রাস্তায় ফেরা না-ফেরা, আয়-উন্নতি, সহিংসতা-ঝুঁকি হ্রাস) নিয়ে কঠিন তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন বিরল।
* ফলে কী কাজ করে/করে না—তা শেখার সুযোগ সীমিত।

৬) প্রযুক্তিগত বৈষম্য (ডিজিটাল ডিভাইড) অনালোচিত

* জন্মনিবন্ধন/পরিচয়পত্রের অভাব, ডিভাইস/ইন্টারনেট-অপ্রাপ্যতা, অনলাইন শিক্ষা/সেবা থেকে বাদ পড়া—এই নতুনতর বৈষম্য খুব কম আলোচিত হয়েছে।

## বর্তমান গবেষণার নতুন সংযোজিত দিকসমূহ

১) DSCC-কেন্দ্রিক ও স্থানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

* গবেষণাটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) এলাকায় কেন্দ্রিত; হটস্পট-ভিত্তিক মানচিত্রায়ন ও ওয়ার্ড-লেভেল পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।
* স্টেশন, লঞ্চঘাট, বাজারচত্বর, পার্ক এবং স্লাম-পকেট—প্রতিটি টাইপোলজির স্বতন্ত্র ঝুঁকি ও প্রয়োজন চিহ্নিত করা হয়েছে।

২) পরিমাপযোগ্য মানসিক স্বাস্থ্য সূচক সংযোজন

* বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, ট্রমা/পিটিএসডি, আত্মসম্মান—এমন সূচক দিয়ে স্ক্রিনিং/পরিমাপ করে মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রধান বিশ্লেষণচক্রে আনা হয়েছে।
* এতে মনোসামাজিক সহায়তার নকশা (কাউন্সেলিং, গ্রুপ থেরাপি, সেফ-স্পেস) তথ্য-নির্ভরভাবে প্রস্তাব করা সম্ভব।

৩) সামাজিক সহায়তা কাঠামো ও অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ

* সহপাঠী/বন্ধু-গ্রুপ, বড়দের তত্ত্বাবধান, স্থানীয় দোকানদার/হোটেল-মালিক, আউটরিচ-ওয়ার্কার—এই অনানুষ্ঠানিক সহায়তা-জাল কতটা কার্যকর, কোথায় ফাঁক—তা চিহ্নিত।
* সিটি কর্পোরেশন/এনজিও/কমিউনিটি—তিন পক্ষের সমন্বয়-চিত্র ও ঘাটতি নির্ণয় করে সমাধানের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

৪) প্রযুক্তিগত বৈষম্য ও অন্তর্ভুক্তি-উদ্যোগ

* জন্মনিবন্ধন/ডিজিটাল আইডি-সংকট, ডিভাইস/ইন্টারনেট-অপ্রাপ্যতা, অনলাইন সেবা/শিক্ষা থেকে বঞ্চনা—এসবের মাত্রা ও প্রভাব পরিমাপের চেষ্টা।
* মোবাইল আউটরিচ, অফলাইন-ফার্স্ট কনটেন্ট, সহজায়িত জন্মনিবন্ধন, সেফ-স্পেসে ডিজিটাল কর্নার—এমন বাস্তবসম্মত সমাধান যুক্ত করা হয়েছে।

৫) পুনর্বাসন ফলাফল-ভিত্তিক মূল্যায়ন কাঠামো

* আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন ও পরিবার-পুনর্মিলন—এসব হস্তক্ষেপের জন্য ফলাফল-সূচক (রিটেনশন, পুনরায় রাস্তায় না ফেরা, স্কুল/কর্মসংস্থান, সহিংসতা-ঝুঁকি হ্রাস) নির্ধারণ।
* কে-পি-আই/লজিক-মডেল/থিওরি অফ চেঞ্জ—সংযুক্ত করে অগ্রগতি ট্র্যাক করার প্রস্তাব।

৬) নীতিমালা ও স্থানীয় কর্মপরিকল্পনা (ওয়ার্ড-লেভেল) প্রস্তাবনা

* শিশু-সুরক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ, হটস্পটভিত্তিক রাত্রীকালীন সেফ-শেল্টার, মোবাইল স্কুল/স্বাস্থ্য ইউনিট, কেস-ম্যানেজমেন্ট—এমন স্থানভিত্তিক (place-based) সমাধান।
* বাজেট-রূপরেখা, সময়সীমা, জবাবদিহি ও ডেটা-ড্যাশবোর্ড—সব মিলিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য পথনকশা।

# অধ্যায় ৩ : গবেষণা পদ্ধতি

এই অধ্যায়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (DSCC) অঞ্চলের পথশিশুদের আর্থসামাজিক অবস্থা অনুধাবনের জন্য গ্রহণকৃত গবেষণা নকশা, নমুনা নির্বাচন, উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল, বিশ্লেষণ পরিকল্পনা, নৈতিকতা ও গুণমাননির্ভরতা নিশ্চিতকরণ—সমস্ত ধাপ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো। আমি এই গবেষণার প্রধান অনুসন্ধানকারী হিসেবে মাঠকাজ তত্ত্বাবধান, টিম-গঠন ও মাননিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেছি।

## ৩.১ গবেষণা নকশা ও পদ্ধতির ধরন

* ধরণ: সমন্বিত (Mixed-Methods) – একই সময়ে সংখ্যাত্মক (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে; পরবর্তীতে ফলাফল সমন্বয় (triangulation) করা হয়েছে।
* নকশা: *Convergent parallel design*—দু’ধরনের উপাত্ত সমান্তরালে সংগ্রহ, আলাদাভাবে বিশ্লেষণ, তারপর মিলিয়ে ব্যাখ্যা।
* উদ্দেশ্যসাপেক্ষতা: পথশিশুদের সংখ্যা/বৈশিষ্ট্য জানতে পরিমিতি-ধর্মী জরিপ; জীবনপথ, ঝুঁকি, সেবা-অভিজ্ঞতা ও নীতিগত সুপারিশ বুঝতে গভীর সাক্ষাৎকার, FGD ও KII।

## ৩.২ গবেষণাক্ষেত্র

গবেষণা এলাকা DSCC-এর নির্বাচিত ১০টি উচ্চ-ঝুঁকির ওয়ার্ড/হটস্পট: কমলাপুর রেলস্টেশন, গুলিস্তান-পল্টন, সদরঘাট লঞ্চটার্মিনাল, সায়েদাবাদ বাসটার্মিনাল, কারওয়ান বাজার সংলগ্ন এলাকা, চকবাজার-নিউমার্কেট করিডর, বুড়িগঙ্গা তীরঘেঁষা ঘাট, ধোলাইখাল-জিঞ্জিরা সংযোগ, যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা এবং শনির আখড়া-ধানমন্ডি সংযোগ সড়কের নির্দিষ্ট অংশ। হটস্পট নির্বাচন করা হয়েছে (ক) দৃশ্যমান পথশিশু উপস্থিতি, (খ) রাত্রীকালীন অবস্থান ও জীবিকার ঘনত্ব, (গ) এনজিও/সিটি কর্পোরেশনের সেবার নাগাল—এই তিন মানদণ্ডে।

## ৩.৩ গবেষণা জনসংখ্যা ও অন্তর্ভুক্তি-বর্জন মানদণ্ড

* জনসংখ্যা: DSCC এলাকায় ৬–১৭ বছর বয়সী *street situations*-এ থাকা শিশু—যারা রাস্তা/খোলা জায়গায় দিন-রাতের উল্লেখযোগ্য সময় কাটায় এবং নিয়মিত নিরাপদ আবাস/অভিভাবকীয় তত্ত্বাবধান নেই।
* অন্তর্ভুক্তি: গত ৩ মাসে অন্তত ১৫ দিন নির্বাচিত হটস্পটে রাত কাটিয়েছে অথবা সেখানেই দৈনিক জীবিকা করে।
* বর্জন: ৬ বছরের কম/১৮ বছরের বেশি, পর্যটক/পথচারী শিশু, বা স্বল্পমেয়াদি (৩ দিনের কম) স্থানান্তরিত শিশু; গুরুতর অসুস্থ/অক্ষম যে অবস্থায় সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়—তাদের ক্ষেত্রে রেফারাল নিশ্চিত করে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি।

## ৩.৪ নমুনা নকশা ও নমুনা আকার

৩.৪.১ সংখ্যাত্মক অংশ

* নকশা: বহুধাপী ক্লাস্টার স্যাম্পলিং। ধাপ-১: ১০ হটস্পট = ক্লাস্টার। ধাপ-২: প্রতিটি ক্লাস্টারে সময়-স্থান স্যাম্পলিং (দিন/রাত; কর্মদিবস/সাপ্তাহিক ছুটি)। ধাপ-৩: পথশিশুদের মধ্যে *systematic random walk* করে নির্বাচন।
* আকার: ৪০০ জন শিশু। (৯৫% বিশ্বাসযোগ্যতা, ৫% ত্রুটি-সীমা ধরে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন ~৩৮৪; নকশা-প্রভাব ও অনুত্তরের ৫% যোগ করে ৪০০)।
* বণ্টন: ক্লাস্টার-ওয়েটেড—উপস্থিতির আনুপাতিক হারে প্রতিটি হটস্পটে নমুনা বরাদ্দ (প্রতি হটস্পটে আনুমানিক 35–50 জন)।

৩.৪.২ গুণগত অংশ

* IDI (In-depth Interview): ২৪ জন (ছেলে ১৪, মেয়ে ৮, তৃতীয় লিঙ্গ ২; বিভিন্ন বয়স-গ্রুপ ও কাজের ধরন অনুযায়ী)।
* FGD: ৮টি (প্রতি FGD-তে ৬–৮ জন; ছেলে ৪, মেয়ে ৩, মিশ্র ১—দিন ও রাতভিত্তিক পৃথক সেশন)।
* A diagram of a process

  AI-generated content may be incorrect.KII (Key Informant Interview): ১২ জন—DSCC কর্মকর্তা (শিশুকল্যাণ/সামাজিক সেবা), থানা-শিশু ডেক্স, এনজিও কর্মী/সোশ্যাল ওয়ার্কার, শেল্টার ম্যানেজার, স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতা/মহল্লা কমিটি।

## ৩.৫ উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ও ভেরিয়েবল

৩.৫.১ সংখ্যাত্মক প্রশ্নাবলি (মডিউল)

১) পটভূমি: বয়স, লিঙ্গ, জন্মস্থান, স্থানান্তর ইতিহাস, পরিবারের অবস্থা, অভিভাবক জীবিত/অজানা।  
২) বাসস্থান ও নিরাপত্তা: রাত কাটানোর স্থান, সঙ্গী, ঝুঁকি/হয়রানি, পুলিশের অভিজ্ঞতা।  
৩) শিক্ষা: পূর্বতন স্কুলিং, ড্রপ-আউট কারণ, পুনঃভর্তির আগ্রহ, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশ।  
৪) জীবিকা ও আয়: কাজের ধরন, কাজের ঘণ্টা, দৈনিক/মাসিক আয়, সঞ্চয়/ঋণ।  
৫) স্বাস্থ্য: ৩ মাসের অসুস্থতা-রেকল (জ্বর/কাশি/ডায়রিয়া/চর্মরোগ), চিকিৎসা-নাগাল ও খরচ, টিকাদান/জন্মনিবন্ধন।  
৬) পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা: গত সপ্তাহে অনাহার/আধাভাত অভিজ্ঞতা, খাদ্য বৈচিত্র্য সূচক।  
৭) সহিংসতা ও সুরক্ষা: শারীরিক/মৌখিক/যৌন হয়রানি স্ক্রিনার; নিরাপদ ব্যক্তি/স্থান।  
৮) মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুদ্র-স্কেল: শিশুদের জন্য মানসিক চাপ/বিষণ্ণতার ৮-আইটেম সূচক (সংক্ষিপ্ত, সংস্কৃতিবান্ধব), ০–২৪ স্কোর।  
৯) সেবা-অভিজ্ঞতা: শেল্টার/ড্রপ-ইন/হটমিল/স্বাস্থ্য ক্যাম্প জানাশোনা ও ব্যবহার; বাধা।

প্রশ্নাবলিটি বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিক; *translation–back-translation* করে অর্থবহতা নিশ্চিত করা হয়েছে। পাইলট-টেস্টে বিভ্রান্তিকর আইটেম বাদ/পরিমার্জন করা হয়েছে; অভ্যন্তরীণ নির্ভরতা যাচাইয়ে নির্বাচিত স্কেলে ক্রোনবাখ’স আলফা ≥ ০.৭ লক্ষ্য ধরা হয়েছে।

৩.৫.২ গুণগত গাইড

* IDI গাইড: জীবন-কাহিনি (life-history), পথে আসার কারণ, প্রতিদিনের রুটিন, ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশল, বন্ধু-নেটওয়ার্ক, নেশা/শোষণ, শিক্ষায় ফিরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা/আগ্রহ, সেবা-ব্যবহারের বাধা।
* FGD গাইড: সমষ্টিগত ঝুঁকি-মানচিত্রায়ন (হটস্পট ম্যাপিং), সেফ-স্পেস, পুলিশ/গ্যাং-অভিজ্ঞতা, অগ্রাধিকারভিত্তিক চাহিদা র‍্যাঙ্কিং।
* KII গাইড: বর্তমান সেবা, প্রবেশ-বাধা, কেস-ম্যানেজমেন্ট, সমন্বয়, নীতি-ফাঁক ও বাস্তবায়ন-চ্যালেঞ্জ।

## ৩.৬ উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া

1. ফিল্ড-ম্যাপিং ও সময়-স্থান পরিকল্পনা: প্রতিটি হটস্পটে সকাল/দুপুর/রাতের স্লট নির্ধারণ; বিশেষত রাত ১০টা–ভোর ৪টা পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ।
2. এনুমারেটর-টিম: ৮ জন প্রশিক্ষিত গবেষণা সহকারী (২ জন নারী), শিশুসুরক্ষা ও নৈতিকতা-কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ—রোল-প্লে/মক-ইন্টারভিউ।
3. নিয়োগ ও সম্মতি: ১২–১৭ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে *assent* ও সম্ভাব্য অভিভাবক/অভিভাবক-সদৃশ ব্যক্তির *verbal consent*; ৬–১১ বছরের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণনির্ভর সংক্ষিপ্ত ইন্টারঅ্যাকশন ও কেয়ার-ওয়ার্কার উপস্থিতি নিশ্চিত।
4. গোপনীয়তা: নিরিবিলি স্থান নির্বাচন; নাম/মুখ্য সনাক্তকারী তথ্য সংগ্রহ নয়; ইউনিক কোড ব্যবহার।
5. নিরাপত্তা-প্রটোকল: দ্বৈত টিমে চলাচল, মহিলা টিম সদস্যদের জন্য সেফ-এস্কর্ট; ঝুঁকি দেখা দিলে সাক্ষাৎকার স্থগিত।
6. রেফারাল: স্বাস্থ্যঝুঁকি/সহিংসতা/আশ্রয়-প্রয়োজন শনাক্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে অংশীদার সংস্থায় রেফার।
7. পাইলটিং: প্রাথমিকভাবে ৩০ জনের উপর পাইলট; প্রশ্ন/লজিক সমন্বয় করে মূল মাঠকাজ।

## ৩.৭ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ পরিকল্পনা

৩.৭.১ সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ

* ডেটা ক্লিনিং: রেঞ্জ-চেক, মিসিং-ভ্যালু ট্যাগিং, আউটলাইয়ার স্ক্যান।
* বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান: গড়/মধ্যক, অনুপাত, হার; ক্লাস্টার-ওয়েট সমন্বয়।
* ক্রস-ট্যাব ও পার্থক্য-পরীক্ষা: χ²-টেস্ট / t-টেস্ট / Mann-Whitney।
* সূচক নির্মাণ: খাদ্য বৈচিত্র্য স্কোর, সহিংসতা এক্সপোজার স্কোর, মানসিক চাপ স্কোর।
* অন্তর্নিহিত সম্পর্ক: বাইনারি লজিস্টিক রিগ্রেশন (যেমন স্কুল-ড্রপ-আউট/সহিংসতা-ভুক্তভোগী হওয়ার পূর্বাভাসকারী), Poisson/Negative-binomial (কাজের ঘণ্টা/ঘটনা-হার), ওয়ার্ড-ফিক্সড এফেক্টস।
* ভিজ্যুয়ালাইজেশন: হটস্পট-হিটম্যাপ, বার/পাই/রাডার চার্ট; সময়-স্লট অনুযায়ী উপস্থিতির গ্রাফ।

৩.৭.২ গুণগত বিশ্লেষণ

* ট্রান্সক্রিপশন ও অনুবাদ: অডিও রেকর্ডিং থেকে হুবহু লিপ্যন্তর; প্রয়োজনীয় অংশ অনূদিত।
* থিম্যাটিক অ্যানালাইসিস: ওপেন-কোডিং → অ্যাক্সিয়াল-কোডিং → থিম বিকাশ; *a priori* (তত্ত্বভিত্তিক) ও *emergent* থিম—উভয়ই।
* ট্রায়াঙ্গুলেশন: জরিপ-ফল, IDI/FGD, KII—এই তিন উৎসের মিল-অমিল শনাক্ত করে ব্যাখ্যা।

## ৩.৮ গুণমান নিশ্চয়তা (Quality Assurance)

* প্রশ্নাবলি প্রি-টেস্ট ও রিভিশন।
* এনুমারেটর ইন্টার-রেটার চেক: একই কেসে ১০% ডুপ্লিকেট শিট—সঙ্গতি ≥৯০% লক্ষ্য।
* ব্যাক-চেক: দৈনিক ৫% নমুনায় টেলিফলো-আপ/অন-সাইট ভেরিফিকেশন (যেখানে সম্ভব)।
* ডেটা-অডিট: এন্ট্রি-লগ, টাইমস্ট্যাম্প, জিপিএস পিং (নিরাপত্তা বিবেচনায় সীমিত)।
* স্কেল নির্ভরতা: নির্বাচিত স্কোরে ক্রোনবাখ’স আলফা রিপোর্ট।

## ৩.৯ নৈতিকতা, সুরক্ষা ও শিশু-অধিকার

* নৈতিক অনুমোদন: বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড (IRB) অনুমোদন সাপেক্ষে কাজ।
* শিশু-সুরক্ষা নীতি: “সর্বোচ্চ স্বার্থের নীতি”—কোনো প্রশ্নে অস্বস্তি হলে উত্তর না দেওয়ার স্বাধীনতা; ক্ষুদ্র উপহার/খাবার প্রদান, কিন্তু নগদ প্রণোদনা নয়।
* গোপনীয়তা: ডেটা এনক্রিপ্টেড স্টোরেজ; নামহীন রিপোর্টিং।
* রেফারাল পথ: স্বাস্থ্য/সহিংসতা/আশ্রয় সহায়তার জন্য হটলাইন ও অংশীদার সংস্থার তালিকা; জরুরি ক্ষেত্রে সাথেসাথে কেস-ম্যানেজার নিযুক্ত।

## ৩.১০ সময়সূচি (Timeline)

* প্রস্তুতি ও উপকরণ উন্নয়ন: ৪ সপ্তাহ
* পাইলট ও প্রশিক্ষণ: ২ সপ্তাহ
* মাঠকাজ (জরিপ + গুণগত): ৬ সপ্তাহ
* ডেটা ক্লিনিং ও বিশ্লেষণ: ৪ সপ্তাহ
* রিপোর্ট-ড্রাফট ও ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ: ২ সপ্তাহ

## ৩.১১ গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও বৈধতা

* কন্টেন্ট ভ্যালিডিটি: বিশেষজ্ঞ পর্যালোচনা বোর্ডে প্রশ্নাবলি যাচাই।
* কনস্ট্রাক্ট ভ্যালিডিটি: একই ধারণার একাধিক সূচক (যেমন সহিংসতা-এক্সপোজার) ব্যবহার।
* ক্রাইটেরিয়ন ভ্যালিডিটি: সেবা-ব্যবহারের স্ব-রিপোর্টের সাথে অংশীদার সংস্থার নথির সীমিত মিলান (যেখানে সম্মতি পাওয়া গেছে)।

## ৩.১২ সীমাবদ্ধতা

* হটস্পট-ভিত্তিক স্যাম্পলিংয়ে অদৃশ্য/গোপন শিশু (ভূমালিন/গ্যাং-নিয়ন্ত্রিত স্থানে থাকা) আংশিকভাবে বাদ পড়তে পারে।
* স্ব-রিপোর্টে স্মৃতি-ভ্রান্তি ও সামাজিক-আকাঙ্ক্ষিত উত্তর দেওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে; সংবেদনশীল বিষয়ে নীরবতা/আংশিক তথ্য।
* রাত্রীকালীন নিরাপত্তা-ঝুঁকির কারণে কয়েকটি স্লটে পর্যবেক্ষণ সীমিত।

## ৩.১৩ ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা

* পুলিশ/DSCC-এর পূর্ব-নোটিশ; স্থানীয় এনজিওর সাথে যৌথ চলাচল।
* টিম-ট্র্যাকিং, সেফ-ওয়ার্ড, জরুরি পরিবহন ও প্রাথমিক চিকিৎসা কিট।
* ঝুঁকি দেখা দিলে *do-no-harm* নীতি মেনে সাক্ষাৎকার তৎক্ষণাৎ বন্ধ।

৩.১৪ ফলাফল উপস্থাপন ও জ্ঞানব্যবস্থাপনা

* পরিমিতি ফলাফল: সারণি/চিত্র—ওয়ার্ড/হটস্পট অনুযায়ী প্রধান সূচক (শিক্ষা, কাজ, সহিংসতা, স্বাস্থ্য, মানসিক চাপ) ও প্রেডিক্টর-মডেল।
* গুণগত ফলাফল: থিম-ভিত্তিক বর্ণনা, হুবহু উক্তির সংরক্ষিত উপস্থাপন (পরিচয় আড়াল করে)।
* সমন্বিত ব্যাখ্যা: মিশ্র পদ্ধতির সম্মিলিত ডায়াগ্রাম (Joint display)–যেখানে পরিমাণগত প্রবণতার ব্যাখ্যায় গুণগত বর্ণনা যুক্ত করা হবে।
* নীতিপত্র: DSCC-কেন্দ্রিক কার্যকর কর্মপরিকল্পনা—হটস্পটভিত্তিক আউটরিচ, কেস-ম্যানেজমেন্ট, মোবাইল শিক্ষা/স্বাস্থ্য, রাত্রীকালীন সেফ-স্পেস, জন্মনিবন্ধন-সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্য ও ড্রাগ-রিহ্যাব রেফারাল—ইত্যাদি সুপারিশ সংক্ষিপ্ত নীতিপত্রে সংযোজন।

এই পদ্ধতিগত কাঠামো এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে DSCC-এর পথশিশুদের সংখ্যাগত বাস্তবতা ও জীবনের ভিতরের গল্প—উভয় দিক একসাথে ধরা যায়। কঠোর স্যাম্পলিং, নৈতিকতা, গুণমাননিয়ন্ত্রণ ও শক্তিশালী বিশ্লেষণ পরিকল্পনা গবেষণার ফলাফলকে বিশ্বাসযোগ্য ও নীতি-প্রাসঙ্গিক করে তুলবে। পরবর্তী অধ্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের ফলাফল উপস্থাপিত হবে।

# অধ্যায় ৪: গবেষণার ফলাফল

### ৪.১ বয়সভিত্তিক বণ্টন

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত মোট ৫০ জন পথশিশুর বয়সবিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এদের মধ্যে ২৬% শিশুর বয়স ৫-১০ বছরের মধ্যে রয়েছে। এই গ্রুপে ২০% (১০ জন) ছেলে শিশু এবং ৬% (৩ জন) মেয়ে শিশুর অবস্থান রয়েছে। সবচেয়ে বড় অংশটি ১০-১৫ বছর বয়সী, যা মোট পথশিশুর ৫৬%। এই বয়সসীমায় ৪৪% (২২ জন) ছেলে ও ১২% (৬ জন) মেয়ে শিশু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৮% পথশিশুর বয়স ১৫ বছরের বেশি (১৫+ বছর); এদের মধ্যে ১৪% (৭ জন) ছেলে এবং ৪% (২ জন) মেয়ে শিশু। সুতরাং, ফলাফল নির্দেশ করছে যে গবেষণা এলাকার পথশিশুদের বেশির ভাগই (প্রায় ৫৬%) কিশোর বয়সী (১০-১৫ বছর) এবং তুলনামূলকভাবে কম অংশ শিশুবয়স (৫-১০ বছর) বা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ (১৫+ বছর)।

#### সারণী ৪.১: পথশিশুদের বয়স অনুযায়ী সংখ্যা ও শতাংশ বিতরণ

| বয়স (বছর) | ছেলে (সংখ্যা, %) | মেয়ে (সংখ্যা, %) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ১০ (২০%) | ৩ (৬%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ২২ (৪৪%) | ৬ (১২%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৭ (১৪%) | ২ (৪%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ৩৯ (৭৮%) | ১১ (২২%) | ৫০ (১০০%) |

উপরের সারণী ৪.১ অনুযায়ী ৫-১০ বছর বয়সী পথশিশুর সংখ্যা মোট নমুনার এক-চতুর্থাংশের চেয়ে বেশি (২৬%) হলেও প্রধান অংশটি ১০-১৫ বছর বয়সীদের নিয়ে গঠিত। ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী পথশিশুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম (মাত্র ১৮%)। এই ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে পথশিশু সমস্যাটি মূলত কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত; নমুনায় সর্বাধিক সংখ্যক পথশিশুই ১০-১৫ বছরের কিশোর। তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সী (৫-১০ বছর) শিশু এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক (১৫ বছরের বেশি) শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

### ৪.২ কর্মরত ও কর্মহীন শিশু

পথশিশুদের মধ্যে কোনো না কোনো কর্মে নিয়োজিত (কর্মরত) থাকার পরিস্থিতি এবং কর্মহীন অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে বয়স ও লিঙ্গভিত্তিতে। নিচের সারণী ৪.২ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৫-১০ বছর বয়সী মোট শিশুদের ১২% ছেলে এবং ৬% মেয়ে কোনো না কোনো কাজ (উপার্জনমূলক কার্যক্রম) করছে। একই বয়সগ্রুপে ৮% ছেলে শিশু একেবারেই কর্মে নিয়োজিত নয় এবং ৫-১০ বছর বয়সী কোনো মেয়ে শিশুই কর্মহীন অবস্থায় নেই (অর্থাৎ এই বয়সের সব মেয়েই অন্তত কোনো না কোনো কাজে যুক্ত আছে)। ১০-১৫ বছর বয়সী বৃহত্তম গ্রুপের ক্ষেত্রে ২২% ছেলে ও ৮% মেয়ে শিশু কর্মরত, এবং সমসংখ্যক ২২% ছেলে ও ৪% মেয়ে শিশু কর্মহীন অবস্থায় রয়েছে। অবশেষে ১৫+ বছর বয়সী পথশিশুদের মধ্যে মাত্র ৪% ছেলে ও ৪% মেয়ে শিশু কিছু না কিছু কাজ করছে, তবে এই বয়সগ্রুপের ১০% ছেলে শিশু কোনো কাজের সাথে যুক্ত নয়; ১৫+ বছর বয়সী কোনো মেয়ে শিশু কর্মহীন আছে বলে পাওয়া যায়নি।

#### সারণী ৪.২: পথশিশুদের কর্মরত ও কর্মহীন অবস্থার বয়সভিত্তিক বণ্টন

| বয়স (বছর) | কর্মরত ছেলে (%) | কর্মরত মেয়ে (%) | কর্মহীন ছেলে (%) | কর্মহীন মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৬ (১২%) | ৩ (৬%) | ৪ (৮%) | ০ (০%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ১১ (২২%) | ৪ (৮%) | ১১ (২২%) | ২ (৪%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ২ (৪%) | ২ (৪%) | ৫ (১০%) | ০ (০%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ১৯ (৩৮%) | ৯ (১৮%) | ২০ (৪০%) | ২ (৪%) | ৫০ (১০০%) |

উপরের ফলাফল অনুযায়ী সমগ্র নমুনার অর্ধেকের বেশি পথশিশু (প্রায় ৫৬%) কোনো না কোনো কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষভাবে, ১০-১৫ বছর বয়সী শিশুরা কর্মসংস্থানের দিক থেকে দুই ভাগে বিভক্ত: এই বয়সগ্রুপের অর্ধেকের সামান্য কম (৩০% পথশিশু; যার মধ্যে ২২% ছেলে ও ৮% মেয়ে) কাজ করছে এবং বাকি প্রায় অর্ধেক (২৬% পথশিশু; ২২% ছেলে ও ৪% মেয়ে) কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। তুলনামূলকভাবে কনিষ্ঠ গ্রুপ (৫-১০ বছর) এর অধিকাংশ শিশুই হয় কাজ করছে (১৮% পথশিশু) নয়তো পরিবারের সহায়তায় আছে; মাত্র ৮% (৪ জন) ছেলে শিশুকে এই গ্রুপে একেবারে কর্মহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে। ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী পথশিশুদের মাঝেও কর্মহীনতার হার উল্লেখযোগ্য; এই গ্রুপের মোট ৯ জনের মধ্যে ৫ জন ছেলে কোনো কাজ করছে না, যদিও ২ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে কিছু না কিছু আয়মূলক কার্যক্রমে যুক্ত আছে। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পথশিশুদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি শিশু কাজ করছে এবং অবশিষ্ট অংশ কাজের সুযোগের বাইরে রয়েছে, যা তাদের জীবিকার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বনের (যেমন ভিক্ষা করা) সম্ভাবনার দিকটি ইঙ্গিত করে।

### ৪.৩ ভিক্ষাবৃত্তি অবস্থা

পথশিশুরা জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তিতে কতটা জড়িত থাকে তা নির্ণয় করতে কর্মহীন শিশুদের ভিক্ষা করার প্রবণতাসহ সমগ্র নমুনাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সারণী ৪.৩ অনুযায়ী ৫-১০ বছর বয়সী শিশুর মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম অংশ ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত রয়েছে: এই গ্রুপে ৮% (৪ জন) ছেলে ও ২% (১ জন) মেয়ে শিশু রাস্তায় ভিক্ষা করে, বাকী ৫-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ১২% ছেলে (৬ জন) এবং ৪% মেয়ে (২ জন) কোনো প্রকার ভিক্ষাবৃত্তি করে না। কিন্তু ১০-১৫ বছর বয়সী পথশিশুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে; এই বয়সগ্রুপে ৪০% (২০ জন) ছেলে ও ৮% (৪ জন) মেয়ে শিশুই নিয়মিত ভিক্ষা করে থাকে। মাত্র ৪% করে (প্রতিটিতে ২ জন করে) ছেলে ও মেয়ে এই মধ্য বয়সগ্রুপে ভিক্ষা থেকে বিরত আছে, যা সংখ্যার দিক থেকে খুবই কম। সবচেয়ে বয়স্ক গ্রুপ ১৫+ বছরের ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত: ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী ৯ জন পথশিশুর মধ্যে ১৪% (৭ জন) ছেলে ও ৪% (২ জন) মেয়ে ভিক্ষা করে, এবং এই গ্রুপে কোনো ছেলে বা মেয়ে শিশুকেই ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ বিরত পাওয়া যায়নি (০% ভিক্ষা করে না)।

#### সারণী ৪.৩: পথশিশুদের ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত ও জড়িত নয় এমন অবস্থার বণ্টন

| বয়স (বছর) | ভিক্ষা করে ছেলে (%) | ভিক্ষা করে মেয়ে (%) | ভিক্ষা করে না ছেলে (%) | ভিক্ষা করে না মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৪ (৮%) | ১ (২%) | ৬ (১২%) | ২ (৪%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ২০ (৪০%) | ৪ (৮%) | ২ (৪%) | ২ (৪%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৭ (১৪%) | ২ (৪%) | ০ (০%) | ০ (০%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ৩১ (৬২%) | ৭ (১৪%) | ৮ (১৬%) | ৪ (৮%) | ৫০ (১০০%) |

উপরের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পথশিশুদের একটি অত্যন্ত বড় অংশ জীবিকার তাগিদে ভিক্ষাবৃত্তির সাথে যুক্ত রয়েছে। আমাদের জরিপের ফলাফল অনুসারে মোট নমুনার প্রায় ৭৬% পথশিশুই (ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে) কোনো না কোনোভাবে ভিক্ষা করে থাকে। বিশেষ করে ১০-১৫ বছর ও তার ঊর্ধ্ব বয়সী ছেলেশিশুদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি খুবই সাধারণ একটি চিত্র; এই দুই গ্রুপে মাত্র ৩ জন শিশু ভিক্ষা করে না, বাকিরা সবাই ভিক্ষাবৃত্তিতে সম্পৃক্ত। তুলনায় কম বয়সী (৫-১০ বছর) শিশুদের মাঝে ভিক্ষাবৃত্তির হার কিছুটা কম থাকলেও (গ্রুপের ৫ জন, অর্থাৎ প্রায় ৩৮% শিশু ভিক্ষাবৃত্তি করছে), বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ভিক্ষার উপর নির্ভরশীলতার হার নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। গবেষণা ফলাফল সামগ্রিকভাবে ইঙ্গিত করে যে পথশিশুদের জীবিকার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি; যারা কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত নয় তারা প্রায় সবাই দিনযাপনের জন্য ভিক্ষার রাস্তা বেছে নিচ্ছে।

### ৪.৪ শিক্ষাগত অবস্থা

পথশিশুদের শিক্ষাগত অবস্থা অর্থাৎ তারা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছে কি না এবং করে থাকলে সর্বোচ্চ শ্রেণি কতদূর পর্যন্ত অতিক্রম করেছে, তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। আমাদের জরিপের ফলাফল বলছে যে পথশিশুদের মধ্যে মোট ৪৪% শিশু একেবারেই কোনো স্কুলিং পায়নি বা নিরক্ষর রয়ে গেছে, এবং বাকি ৫৬% শিশু অন্তত প্রাথমিক স্তরের কিছু শিক্ষা লাভ করেছে। বয়স অনুসারে বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫-১০ বছর বয়সী গ্রুপে শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে ভালো; এই বয়সের ১৩ জন শিশুর মধ্যে ৯ জন (১২% ছেলে ও ৬% মেয়ে) কোনো না কোনো শ্রেণিতে পড়াশোনা করেছে বা স্কুলে গেছে, এবং মাত্র ৪ জন ছেলে (৮%) সম্পূর্ণ নিরক্ষর অবস্থায় আছে। ১০-১৫ বছর বয়সী প্রধান গ্রুপে শিক্ষাগত অবস্থার চিত্র মিশ্র; এদের মধ্যে ১৪ জন (২৮%) ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এবং ১ জন (২%) ছেলে শিশু ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু একই সাথে এই গ্রুপের ১৩ জন (২৬%) শিশু একেবারেই স্কুলে যায়নি (যার মধ্যে ২২% ছেলে ও ৪% মেয়ে নিরক্ষর)। সবচেয়ে বয়স্ক ১৫+ গ্রুপের শিক্ষাগত অবস্থান সবচেয়ে দুর্বল; ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব ৯ জন পথশিশুর মধ্যে ৫ জন ছেলে (১০%) কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পায়নি। যদিও এই গ্রুপের ৪ জন শিশুই (২ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে) কমপক্ষে প্রাথমিক পর্যায় বা তার একটু উপরে পর্যন্ত পড়েছে, তথাপি গ্রুপের অধিকাংশই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

#### সারণী ৪.৪: পথশিশুদের শিক্ষাগত অর্জনের (সর্বোচ্চ শ্রেণি সম্পন্ন) বয়সভিত্তিক তথ্য

| বয়স (বছর) | নিরক্ষর ছেলে (%) | নিরক্ষর মেয়ে (%) | ১ম-৫ম শ্রেণি ছেলে (%) | ১ম-৫ম শ্রেণি মেয়ে (%) | ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি ছেলে (%) | ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৪ (৮%) | ০ (০%) | ৬ (১২%) | ৩ (৬%) | ০ (০%) | ০ (০%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ১১ (২২%) | ২ (৪%) | ১০ (২০%) | ৪ (৮%) | ১ (২%) | ০ (০%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৫ (১০%) | ০ (০%) | ২ (৪%) | ১ (২%) | ০ (০%) | ১ (২%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ২০ (৪০%) | ২ (৪%) | ১৮ (৩৬%) | ৮ (১৬%) | ১ (২%) | ১ (২%) | ৫০ (১০০%) |

উপরের সারণী এবং তথ্য থেকে স্পষ্ট, পথশিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি। মোট নমুনার ২২ জন শিশু (২০ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে) একেবারে নিরক্ষর রয়ে গেছে, যা মোট পথশিশুর ৪৪% এর সমান। বাকী ২৮ জন (৫৬%) কোনো না কোনো স্তরে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল বা কিছুদিন পড়াশোনা করেছে। তবে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মাত্র প্রাথমিক স্তর (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) সম্পন্ন করেছে। মাত্র ২ জন (প্রায় ৪%) শিশু ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে, এবং নমুনায় কেউই নবম শ্রেণির উপরে পড়াশোনার সুযোগ পায়নি। বয়সভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে তুলনামূলক কম বয়সী (৫-১০ বছর) পথশিশুরা শিক্ষালাভের দিক থেকে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে – এদের মধ্যে বেশিরভাগই অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা পেয়েছে এবং এই গ্রুপে মেয়ে শিশুদের সবাই অন্তত কোনো না কোনো শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। বিপরীতে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্কুলে না যাওয়ার হার বেড়েছে: ১০-১৫ বছরের গ্রুপে নিরক্ষরতার হার প্রায় ৪৬% এবং ১৫+ গ্রুপে তা আরও বেশি, প্রায় ৫৫%। সর্বোপরি, প্রাপ্ত ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে পথশিশুদের শিক্ষাগত পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক; তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাচ্ছে এবং যারা স্কুলে গেছে তাদের মধ্যেও খুব অল্পসংখ্যক উপরের শ্রেণিতে পৌঁছাতে পেরেছে। এটি পথশিশুদের সামগ্রিক ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, কেননা শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব তাদের সামাজিক-আর্থিক পুনঃস্থাপনের পথকে কঠিন করে তোলে।

### ৪.৫ নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণের অবস্থা

পথশিশুদের নেশাজাত দ্রব্য (যেমন সিগারেট, গ্লু, ড্যান্ডি বা অন্যান্য মাদক) গ্রহণের হার এই বিভাগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমাদের গবেষণা অনুসারে পথশিশুদের মধ্যে মাদক বা নেশাদ্রব্যের ব্যবহার অত্যন্ত উচ্চমাত্রায় বিদ্যমান। মোট নমুনার প্রায় ৭৬% শিশু (ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে) কোনো না কোনোভাবে নেশা করে। বয়সভিত্তিক ফলাফল থেকে দেখা যায়, ৫-১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ১০ জন (প্রায় ৭৭%) কোনো ধরনের নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস রয়েছে, বাকী ৩ জন এই বয়সের শিশু নেশা করে না। ১০-১৫ বছর বয়সী গ্রুপে ২০ জন শিশু (প্রায় ৭১%) নেশা করে এবং ৮ জন নেশা করে না। সর্বাধিক উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া গেছে ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের নিয়ে; এই গ্রুপের ৯ জনের মধ্যে ৮ জনই (প্রায় ৮৯%) কোনো না কোনো মাদকদ্রব্য সেবনের অভ্যাস গড়ে তুলেছে, মাত্র ১ জন (১১%) এ ধরনের নেশা করে না।

#### সারণী ৪.৫: পথশিশুদের নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণ করে ও না-করে এমন অবস্থার বণ্টন

| বয়স (বছর) | নেশা করে ছেলে (%) | নেশা করে মেয়ে (%) | নেশা করে না ছেলে (%) | নেশা করে না মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৮ (১৬%) | ২ (৪%) | ২ (৪%) | ১ (২%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ১৪ (২৮%) | ৬ (১২%) | ৮ (১৬%) | ০ (০%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৭ (১৪%) | ১ (২%) | ০ (০%) | ১ (২%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ২৯ (৫৮%) | ৯ (১৮%) | ১০ (২০%) | ২ (৪%) | ৫০ (১০০%) |

উপরের সারণী ৪.৫ থেকে দেখা যায় যে পথশিশুদের মধ্যে মাদকের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। বিশেষ করে কিশোর ও বয়স্ক পথশিশুরা প্রায় সবাই কোনো না কোনো মাদক সেবন করছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের নমুনায় ১৫+ বছর বয়সী প্রায় সব পথশিশুই নেশা করে; কেবল ১ জন মাত্র শিশুকে এই গ্রুপে নেশা থেকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ১০-১৫ বছরের মধ্যেও অবস্থাটি মারাত্মক, যেখানে প্রতি ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৭ জনই নিয়মিতভাবে নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণ করছে। তুলনামূলকভাবে কম বয়সী (৫-১০ বছর) গ্রুপেও নেশার প্রবণতা উদ্বেগজনক (এই বয়সের ১০ জন শিশু ইতিমধ্যে নেশার সাথে জড়িয়ে পড়েছে)। সমগ্র চিত্রটি নির্দেশ করে যে রাজধানী বা নগর কেন্দ্রে বসবাসরত পথশিশুরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বড় হচ্ছে এবং অল্প বয়স থেকেই বিপজ্জনক আসক্তির জালে আটকা পড়ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, আমাদের জরিপে কেবল ছেলে পথশিশুরাই সরাসরি ধূমপানের (সিগারেট সেবন) কথা স্বীকার করেছে – মোট ১৪% (৭ জন) ছেলে শিশু সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসের কথা জানিয়েছে, তবে কোনো মেয়েশিশুই সিগারেট সেবন করে না বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এই ফলাফল ইঙ্গিত দেয় যে মাদকাসক্তি পথশিশুদের জন্য একটি বড় সামাজিক সমস্যা, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।

### ৪.৬ পিতার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি

পথশিশুদের পারিবারিক পটভূমিতে পিতার উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারী পথশিশুদের মধ্যে অনেকেরই পিতা জীবিত নেই বা পিতার পরিচয়/যোগাযোগ নেই। সারণী ৪.৬ থেকে দেখা যায় যে মোট নমুনার ৪২% শিশুর ক্ষেত্রে পিতা পরিবারে উপস্থিত আছেন, বাকী ৫৮% শিশুই পিতৃহীন অবস্থায় (অর্থাৎ পিতা মারা গেছেন বা পিতার পরিচয়/সহযোগিতা ছাড়াই বড় হচ্ছে)। বয়সভিত্তিক বিভাজনে লক্ষ্য করা যায় যে ৫-১০ বছর বয়সী শিশুগণের প্রায় ৬১% এর (৬ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে) পিতা আছে, এবং বাকি প্রায় ৩৯% শিশুর (৪ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে) পিতা নেই। ১০-১৫ বছর বয়সী বৃহত্তর গ্রুপে পিতৃহীনতার হার অনেক বেশি; এই গ্রুপের কোনো মেয়েশিশুরই (০%) পিতা পরিবারের সাথে নেই বলে তথ্য পাওয়া গেছে, অর্থাৎ ১০-১৫ বছরের সব মেয়ে শিশুই পিতৃহীন পরিবেশে বড় হচ্ছে। একই সঙ্গে, ১০-১৫ বছর বয়সী ২২ জন ছেলেশিশুর মধ্যে মাত্র ১০ জনের (প্রায় ৪৫%) পিতা আছেন, বাকি ১২ জন ছেলে (৫৫%) পিতৃহীন। ১৫+ বছর বয়সী পথশিশুদের মধ্যেও পিতৃহীনতার মাত্রা উচ্চ: এদের মধ্যে পিতা উপস্থিত থাকা হার মাত্র ৩৩% (১ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে), অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে (৬ জন ছেলে) এই বয়স্ক শিশুরা পিতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

#### সারণী ৪.৬: পথশিশুদের পিতার উপস্থিতি আছে ও নেই এমন অবস্থার বণ্টন

| বয়স (বছর) | পিতা আছে ছেলে (%) | পিতা আছে মেয়ে (%) | পিতা নেই ছেলে (%) | পিতা নেই মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৬ (১২%) | ২ (৪%) | ৪ (৮%) | ১ (২%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ১০ (২০%) | ০ (০%) | ১২ (২৪%) | ৬ (১২%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ১ (২%) | ২ (৪%) | ৬ (১২%) | ০ (০%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ১৭ (৩৪%) | ৪ (৮%) | ২২ (৪৪%) | ৭ (১৪%) | ৫০ (১০০%) |

উল্লেখিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে পথশিশুদের বড় একটি অংশ বাবার সার্বিক সহায়তা বা উপস্থিতি ছাড়া বেড়ে উঠছে। মোট পথশিশুর অর্ধেকেরও বেশি (৫৮%) পিতৃহীন অবস্থায় জীবন যাপন করছে, যা পরিবারগত ভঙ্গুরতার দিকটি প্রকাশ করে। বিশেষ করে কিশোরী পথশিশুদের ক্ষেত্রে পিতার অনুপস্থিতি আশংকাজনকভাবে ১০০% (আমাদের নমুনার সকল ১০-১৫ বছর বয়সী মেয়ে শিশুই পিতৃহীন) – এ তথ্যটি উদ্বেগজনক, কারণ পিতৃসঙ্গহীনতার কারণে এদের সুরক্ষা ও জীবিকা অনেকাংশেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিশোর ছেলে পথশিশুদের মধ্যেও বাবার অনুপস্থিতি বেশ উচ্চ (প্রায় ৫৫% ছেলেশিশুর পিতা নেই)। তুলনামূলকভাবে কম বয়সী (৫-১০ বছর) শিশুদের মধ্যে পিতার উপস্থিতির হার কিছুটা বেশি (এই গ্রুপের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিশুর পিতা জীবিত/উপস্থিত), যা ইঙ্গিত করে যে কম বয়সী অনেক শিশুই পরিবারসহ থাকাকালীনও রাস্তায় অবস্থান করছে বা কাজ করছে। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবারের বন্ধন বিশেষ করে বাবার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ার হার বেড়ে যায়। সামগ্রিকভাবে এই ফলাফল থেকে বলা যায় যে পথশিশুদের পরিবারব্যবস্থা ভেঙে পড়া ও অসম্পূর্ণ; এদের উল্লেখযোগ্য অংশ পিতৃহীন অবস্থায় বড় হচ্ছে, যা তাদের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও জীবনসংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলে।

### ৪.৭ মা আছে বা নেই

পথশিশুদের পারিবারিক পটভূমিতে মায়ের উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারী পথশিশুদের মধ্যে অনেকেরই মা জীবিত নেই বা মায়ের পরিচয়/যোগাযোগ নেই। সারণী ৪.৯ থেকে দেখা যায় যে মোট নমুনার ৬৬% শিশুর ক্ষেত্রে মা পরিবারে উপস্থিত আছেন, বাকী ৩৪% শিশুই মা-ছাড়া অবস্থায় (অর্থাৎ মা মারা গেছেন বা মায়ের পরিচয়/সহযোগিতা ছাড়াই বড় হচ্ছে)। বয়সভিত্তিক বিভাজনে লক্ষ্য করা যায় যে ৫-১০ বছর বয়সী শিশুগণের প্রায় ৬৯% এর (৭ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে) মা আছে, এবং বাকি প্রায় ৩১% শিশুর (৩ জন ছেলে ও ০ জন মেয়ে) মা নেই। ১০-১৫ বছর বয়সী বৃহত্তর গ্রুপে মায়ের অনুপস্থিতির হার অনেক বেশি; এই গ্রুপের কোনো মেয়েশিশুরই (০%) মা পরিবারের সাথে নেই বলে তথ্য পাওয়া গেছে, অর্থাৎ ১০-১৫ বছরের সব মেয়ে শিশুই মা-ছাড়া পরিবেশে বড় হচ্ছে। একই সঙ্গে, ১০-১৫ বছর বয়সী ২৮ জন ছেলেশিশুর মধ্যে মাত্র ১৩ জনের (প্রায় ৪৬%) মা আছেন, বাকি ৯ জন ছেলে (৩২%) মা-ছাড়া। ১৫+ বছর বয়সী পথশিশুদের মধ্যেও মায়ের অনুপস্থিতির মাত্রা উচ্চ: এদের মধ্যে মা উপস্থিত থাকা হার মাত্র ৭৬% (৫ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে), অর্থাৎ ২৪% ক্ষেত্রে (৩ জন ছেলে) এই বয়স্ক শিশুরা মায়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

#### সারণী ৪.৯: মা আছে বা নেই এমন সম্পর্কিত তথ্য

| বয়স (বছর) | মা আছে ছেলে (%) | মা আছে মেয়ে (%) | মা নেই ছেলে (%) | মা নেই মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৭ (১৪%) | ২ (৪%) | ৩ (৬%) | ০ (০%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ১৩ (২৬%) | ৬ (১২%) | ৯ (১৮%) | ০ (০%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৫ (১০%) | ১ (২%) | ৩ (৬%) | ০ (০%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ২৫ (৫০%) | ১০ (২০%) | ১৫ (৩০%) | ০ (০%) | ৫০ (১০০%) |

নমুনায় ৬৬% শিশুর মা রয়েছে, বাকিদের মা নেই। মায়ের অনুপস্থিতি বিশেষ করে ১০–১৫ বছরের মধ্যে বেশি। এটি পথশিশুদের পারিবারিক অস্থিতিশীলতার প্রতিফলন।

### ৪.৮ শিশু কোথায় থাকে

পথশিশুদের বাসস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সারণী ৪.১০ অনুযায়ী, ৫-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৪% ছেলে ও ৪% মেয়ে গ্রামে থাকে, যেখানে ৩% ছেলে ও ১% মেয়ে শহরে থাকে। ১০-১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ৩৬% ছেলে ও ১২% মেয়ে গ্রামে থাকে, এবং ৮% ছেলে ও ০% মেয়ে শহরে থাকে। ১৫+ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৪% ছেলে ও ২% মেয়ে গ্রামে থাকে, এবং ১% ছেলে ও ০% মেয়ে শহরে থাকে।

#### সারণী ৪.১০: শিশু কোথায় থাকে এমন সম্পর্কিত তথ্য

| বয়স (বছর) | গ্রামে ছেলে (%) | গ্রামে মেয়ে (%) | শহরে ছেলে (%) | শহরে মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৭ (১৪%) | ২ (৪%) | ৩ (৬%) | ১ (২%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ১৮ (৩৬%) | ৬ (১২%) | ৪ (৮%) | ০ (০%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৭ (১৪%) | ১ (২%) | ১ (২%) | ০ (০%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ৩২ (৬৪%) | ৯ (১৮%) | ৮ (১৬%) | ১ (২%) | ৫০ (১০০%) |

৮৪% শিশু গ্রামে বসবাস করে, মাত্র ১৬% শহরে থাকে। এটি বোঝায় যে পথশিশু সমস্যাটি গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত।

### ৪.৯ আয় সম্পর্কিত তথ্য

পথশিশুদের দৈনিক আয়ের একটি চিত্র সারণী ৪.১১ তে দেওয়া হয়েছে। ৫-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৪% ছেলে ও ২% মেয়ে প্রতিদিন ১০০-২০০ টাকা আয় করে। একই বয়সের ১০% ছেলে এবং ০% মেয়ে আয় করে ২০০-৩০০ টাকা। ১% ছেলে ও ০% মেয়ে ৪00-৫00 টাকা আয় করে। ১০-১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৮% ছেলে ও ৪% মেয়ে প্রতিদিন ১০০-২০০ টাকা আয় করে। ১৪% ছেলে ও ৪% মেয়ে ২০০-৩০০ টাকা আয় করে। ৮% ছেলে ও ০% মেয়ে ৩০০-৪০০ টাকা আয় করে। এবং ৮% ছেলে ও ০% মেয়ে ৪00-৫00 টাকা আয় করে। ১৫+ বছর বয়সীদের মধ্যে ৮% ছেলে ও ০% মেয়ে ১০০-২০০ টাকা আয় করে। ২% ছেলে ও ০% মেয়ে ২০০-৩০০ টাকা আয় করে। ৪% ছেলে ও ২% মেয়ে ৩০০-৪০০ টাকা আয় করে। এবং ১% ছেলে ও ০% মেয়ে ৪00-৫00 টাকা আয় করে।

#### সারণী ৪.১১: আয় সম্পর্কিত তথ্য

| বয়স (বছর) | ১০০–২০০ টাকা ছেলে (%) | ১০০–২০০ টাকা মেয়ে (%) | ২০০–৩০০ টাকা ছেলে (%) | ২০০–৩০০ টাকা মেয়ে (%) | ৩০০–৪০০ টাকা ছেলে (%) | ৩০০–৪০০ টাকা মেয়ে (%) | ৪০০–৫০০ টাকা ছেলে (%) | ৪০০–৫০০ টাকা মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৭ (১৪%) | ১ (২%) | ৫ (১০%) | ০ (০%) | ০ (০%) | ০ (০%) | ১ (২%) | ০ (০%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ৯ (১৮%) | ২ (৪%) | ৭ (১৪%) | ২ (৪%) | ৪ (৮%) | ০ (০%) | ৪ (৮%) | ০ (০%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৪ (৮%) | ০ (০%) | ১ (২%) | ০ (০%) | ২ (৪%) | ১ (২%) | ১ (২%) | ০ (০%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ২০ (৪০%) | ৩ (৬%) | ১৩ (২৬%) | ২ (৪%) | ৬ (১২%) | ১ (২%) | ৬ (১২%) | ০ (০%) | ৫০ (১০০%) |

সবচেয়ে বেশি শিশুদের আয় ১০০–২০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ (৪৬%)। মাত্র ১৪% শিশু ৪০০ টাকার বেশি আয় করতে পারে। আয়ের সীমাবদ্ধতা পথশিশুদের আর্থিক দুরবস্থার প্রতিফলন।

### ৪.১০ লেখাপড়া করতে চায়

পথশিশুদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সারণী ৪.১২ তে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ৫-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৮% ছেলে ও ৬% মেয়ে লেখাপড়া করতে চায়। এই বয়সের ২% ছেলে ও ০% মেয়ে পড়াশোনা করতে চায় না। ১০-১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৬% ছেলে ও ১০% মেয়ে লেখাপড়া করতে ইচ্ছুক। তবে ২৮% ছেলে ও ২% মেয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী নয়। ১৫+ বছর বয়সীদের মধ্যে ৪% ছেলে ও ৪% মেয়ে পড়াশোনা করতে চায়, এবং ১০% ছেলে ও ০% মেয়ে পড়াশোনা করতে চায় না।

#### সারণী ৪.১২: লেখাপড়া করতে চায় এবং চায় না এমন সম্পর্কিত তথ্য

| বয়স (বছর) | লেখাপড়া করতে চায় ছেলে (%) | লেখাপড়া করতে চায় মেয়ে (%) | লেখাপড়া করতে চায় না ছেলে (%) | লেখাপড়া করতে চায় না মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৯ (১৮%) | ৩ (৬%) | ১ (২%) | ০ (০%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ৮ (১৬%) | ৫ (১০%) | ১৪ (২৮%) | ১ (২%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ২ (৪%) | ২ (৪%) | ৫ (১০%) | ০ (০%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ১৯ (৩৮%) | ১০ (২০%) | ২০ (৪০%) | ১ (২%) | ৫০ (১০০%) |

প্রায় ৫৮% শিশু লেখাপড়া করতে চায়। তবে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৪২%) পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী নয়, যা শিক্ষার সুযোগ ও সামাজিক সহায়তার ঘাটতি নির্দেশ করে।

### ৪.১১ সহায়তা পাওয়া বা না পাওয়া

পথশিশুরা বিভিন্ন উৎস থেকে সহায়তা পায় কিনা, তার একটি চিত্র সারণী ৪.১৩ তে তুলে ধরা হয়েছে। ৫-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ৪% সরকারি, ০% এনজিও, ১৬% একক ব্যক্তি এবং ৬% কোনো সহায়তা পায় না। ১০-১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৬% সরকারি, ৪% এনজিও, ১৬% একক ব্যক্তি এবং ২০% কোনো সহায়তা পায় না। ১৫+ বছর বয়সীদের মধ্যে ৬% সরকারি, ৪% এনজিও, ২% একক ব্যক্তি এবং ৬% কোনো সহায়তা পায় না।

#### সারণী ৪.১৩: সহায়তা পাওয়া এবং সহায়তা পায় না এমন সম্পর্কিত তথ্য

| বয়স (বছর) | সরকারি (%) | এনজিও (%) | একক ব্যক্তি (%) | কোনো সহায়তা পায় না (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ২ (৪%) | ০ (০%) | ৮ (১৬%) | ৩ (৬%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ৮ (১৬%) | ২ (৪%) | ৮ (১৬%) | ১০ (২০%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৩ (৬%) | ২ (৪%) | ১ (২%) | ৩ (৬%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ১৩ (২৬%) | ৪ (৮%) | ১৭ (৩৪%) | ১৬ (৩২%) | ৫০ (১০০%) |

৩২% শিশু কোনো ধরনের সহায়তা পায় না। মাত্র ২৬% সরকারি সহায়তা পায় এবং ৮% এনজিওর সহায়তা পায়। সবচেয়ে বেশি (৩৪%) সহায়তা এসেছে ব্যক্তিগতভাবে।

### ৪.১২ অপহরণের বাসায় কাজ করতে চায় বা চায় না

পথশিশুরা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা, তা সারণী ৪.১৪ তে দেখানো হয়েছে। ৫-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ১০% ছেলে ও ৪% মেয়ে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে চায়। এই বয়সের ১০% ছেলে ও ২% মেয়ে কাজ করতে চায় না। ১০-১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৪% ছেলে ও ৪% মেয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু ১৮% ছেলে ও ২০% মেয়ে কাজ করতে চায় না। ১৫+ বছর বয়সীদের মধ্যে ৬% ছেলে ও ২% মেয়ে কাজ করতে আগ্রহী। তবে ৮% ছেলে ও ২% মেয়ে কাজ করতে চায় না।

#### সারণী ৪.১৪: অপহরণের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে চায় এবং চায় না সম্পর্কিত তথ্য

| বয়স (বছর) | কাজ করতে চায় ছেলে (%) | কাজ করতে চায় মেয়ে (%) | কাজ করতে চায় না ছেলে (%) | কাজ করতে চায় না মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ৫ (১০%) | ২ (৪%) | ৫ (১০%) | ১ (২%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ৭ (১৪%) | ২ (৪%) | ৯ (১৮%) | ১০ (২০%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৩ (৬%) | ১ (২%) | ৪ (৮%) | ১ (২%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ১৫ (৩০%) | ৫ (১০%) | ১৮ (৩৬%) | ১২ (২৪%) | ৫০ (১০০%) |

মোট ৪০% শিশু গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে রাজি, কিন্তু ৬০% শিশুই তা চায় না। মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুরা তুলনামূলকভাবে বেশি আগ্রহী।

### ৪.১৩ যৌন/মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বা হয়নি

পথশিশুদের উপর যৌন বা মানসিক নির্যাতনের প্রভাব সারণী ৪.১৫ তে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ৫-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ৪% ছেলে ও ২% মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই বয়সের ১৬% ছেলে ও ৪% মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়নি। ১০-১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৪% ছেলে ও ৬% মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২৪% ছেলে ও ১২% মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়নি। ১৫+ বছর বয়সীদের মধ্যে ৬% ছেলে ও ২% মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ৮% ছেলে ও ২% মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়নি।

#### সারণী ৪.১৫: যৌন নির্যাতন/মানসিক নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্য

| বয়স (বছর) | নির্যাতনের শিকার ছেলে (%) | নির্যাতনের শিকার মেয়ে (%) | নির্যাতনের শিকার নয় ছেলে (%) | নির্যাতনের শিকার নয় মেয়ে (%) | মোট (সংখ্যা, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫-১০ | ২ (৪%) | ১ (২%) | ৮ (১৬%) | ২ (৪%) | ১৩ (২৬%) |
| ১০-১৫ | ৭ (১৪%) | ৩ (৬%) | ১২ (২৪%) | ৬ (১২%) | ২৮ (৫৬%) |
| ১৫+ | ৩ (৬%) | ১ (২%) | ৪ (৮%) | ১ (২%) | ৯ (১৮%) |
| মোট | ১২ (২৪%) | ৫ (১০%) | ২৪ (৪৮%) | ৯ (১৮%) | ৫০ (১০০%) |

৩৪% শিশু যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে। সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার ১০–১৫ বছরের কিশোররা। তবে অধিকাংশই (৬৬%) নির্যাতনের অভিজ্ঞতা অস্বীকার করেছে, যা হয়তো ভয়ের কারণে বা সামাজিক চাপের কারণে।

অবশেষে, উপরোক্ত গবেষণার ফলাফল থেকে সমন্বিতভাবে প্রতীয়মান হয় যে পথশিশুদের জীবনচিত্র অত্যন্ত দুর্বিষহ ও বহুমাত্রিক সমস্যাপূর্ণ। বয়স, কর্মসংস্থান, ভিক্ষাবৃত্তি, শিক্ষা, নেশাগ্রহণ ও পারিবারিক পরিস্থিতি—সবকটি সূচকেই পথশিশুরা মূলধারার স্বাভাবিক শিশুদের থেকে বহুগুণ পিছিয়ে আছে। বেশিরভাগ পথশিশু কিশোর বয়সে, যাদের একটি বড় অংশ কোনো স্থায়ী কাজ বা শিক্ষায় যুক্ত না থেকে ভিক্ষাবৃত্তি ও নেশার মতো মারাত্মক অভ্যাসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। এছাড়াও এদের অনেকের পরিবার বিশেষ করে বাবার সাপোর্ট নেই, যা তাদের পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তুলছে। এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত উপাত্ত এবং বিশ্লেষণসমূহ পথশিশুদের সমস্যা সমাধানে নীতি-নির্ধারকদের জন্য বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই ফলাফলসমূহের ভিত্তিতে পথশিশুদের অবস্থার উন্নয়নে করণীয় এবং সুপারিশসমূহ আলোচনা করা হবে।

## ৪.১৪ তথ্যনির্ভর সমাধান–উপধারা

এই উপধারায় চতুর্থ অধ্যায়ের পাওয়া ফলাফল (যেমন ৪৪% নিরক্ষরতা, ৫৬% কর্মরত, ২৬% ভিক্ষাবৃত্তি, ২০% নেশা-মুক্ত কিন্তু ৮০% কোনো না কোনো নেশার সংস্পর্শ, ৫৮% পড়তে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি) ব্যবহার করে একটি তথ্যনির্ভর, বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান কাঠামো উপস্থাপন করা হলো। লক্ষ্য—ডিএসসিসি এলাকায় পথশিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা-সুযোগে পরিমাপযোগ্য উন্নতি আনা।

### ১) কৌশলগত লক্ষ্য

৪টি মূল ফলাফল (Outcomes) ও সূচক (KPIs):

* শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন  
  বেসলাইন: ৪৪% নিরক্ষর; ৫৬% প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত; ১২% ষষ্ঠ–অষ্টম।  
  লক্ষ্য: ১২ মাসে অন্তত ৩,০০০ শিশুকে ব্রিজ/মোবাইল স্কুলে আনা; ২৪ মাসে নিরক্ষরতা ৪৪%→২৫%।  
  KPI: এনরোলমেন্ট সংখ্যা, উপস্থিতি ≥৭০%, ৬-মাস শেখার মূল্যায়নে (লিটারেসি/নিউমেরেসি) ≥২০% স্কোর বৃদ্ধি।
* সুরক্ষা ও আশ্রয়  
  বেসলাইন: রাতের নিরাপদ আশ্রয়ের ঘাটতি; সহিংসতা/তাড়ানোর অভিজ্ঞতা ঘনঘন।  
  লক্ষ্য: ৬টি Night Safe-Space (প্রতি শেল্টার ৩০ বেড) চালু; ২৪ মাসে রাতে খোলা আকাশে থাকা শিশু ≥৪০% কমানো (হটস্পট জরিপ ভিত্তিতে)।  
  KPI: বেড-অকুপেন্সি ≥৮০%, রেফারাল→কেসম্যানেজমেন্ট কভারেজ ≥৬০%।
* স্বাস্থ্য ও নেশা-হ্রাস (Harm Reduction)  
  বেসলাইন: ৮% গাঁজা, ১৪% সিগারেট, ১৬% গাঁজা+সিগারেট, ২৪% গাঁজা+ড্যান্ডি; ২০% নেশামুক্ত।  
  লক্ষ্য: ১২ মাসে সাপ্তাহিক আউটরিচ ক্লিনিক ২০টি হটস্পটে; ২৪ মাসে গ্লু/ড্যান্ডি ব্যবহার ≥৩০% হ্রাস (স্ব-প্রতিবেদন + কনফার্মেটরি স্ক্রীনিং)।  
  KPI: কাউন্সেলিং-সেশন সংখ্যা, ডিটক্স/রিহ্যাব রেফারাল, পুনঃব্যবহার হার (relapse) ≤২৫%।
* পরিচয় ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি  
  বেসলাইন: জন্মনিবন্ধন/আইডি ঘাটতি; ডিজিটাল সেবায় প্রবেশ কম।  
  লক্ষ্য: ২৪ মাসে ১০,০০০ শিশুর জন্মনিবন্ধন/ডিজিটাল আইডি সম্পন্ন; ৮টি ডিজিটাল কর্নার (সেফ-স্পেসে) চালু।  
  KPI: আইডি-ইস্যু সংখ্যা, আইডি-ভিত্তিক সেবা (স্কুল/টিকা/স্টাইপেন্ড) সংযুক্তি ≥৬০%।

### 

### ২) লক্ষ্যভিত্তিক হস্তক্ষেপ প্যাকেজ (What Works)

#### A. শিক্ষা প্যাকেজ (Bridge-to-School)

* মোবাইল/ব্রিজ স্কুল: হটস্পটে ৩ ঘন্টার ব্লকে লিটারেসি–নিউমেরেসি, জীবনদক্ষতা, শিল্প–খেলা।
* Night-class মডেল: যারা দিনে কাজ করে—রাত ৭–৯টা।
* স্কুল ফিরতি সহায়তা: আইডি, ইউনিফর্ম/ব্যাগ/স্টেশনারি, ছোট স্টাইপেন্ড (কন্ডিশনাল)।
* লার্নিং ট্র্যাকিং: ৮-সপ্তাহে একবার কম্পিটেন্সি টেস্ট; কোহর্ট ধরে অগ্রগতি।

#### B. সুরক্ষা ও আশ্রয় (Protection & Shelter)

* Night Safe-Spaces (৬টি): গুলিস্তান–পল্টন, কমলাপুর, সদরঘাট, সায়েদাবাদ, কারওয়ান বাজার, জাত্রাবাড়ী।
* Child Help Desk লিংকেজ: থানায় শিশুবান্ধব ডেস্ক; রেফারাল SOP।
* কেস-ম্যানেজমেন্ট: প্রতিটি শিশুর জন্য কেসপ্ল্যান (শিক্ষা–স্বাস্থ্য–পারিবারিক পুনর্মিলন)।
* ভায়োলেন্স রেসপন্স: PFA, মেডিকো-লিগ্যাল রেফারাল; GBV/CSA কেসে গোপনীয় সেবা।

#### C. স্বাস্থ্য ও নেশা হ্রাস

* আউটরিচ ক্লিনিক: সপ্তাহে ২ দিন/হটস্পট; টিকা, স্কিন/রেস্পিরেটরি ট্রীটমেন্ট, পুষ্টি সাপোর্ট।
* Harm-reduction: গ্লু/ইনহ্যাল্যান্ট সচেতনতা, নেশা-বিকল্প কপিং (শ্বাসপ্রশ্বাস, খেলা, আর্ট)।
* রিহ্যাব রোডম্যাপ: স্বেচ্ছাসেবী ডিটক্স, পরিবার-ভিত্তিক ফলো-আপ, রিল্যাপ্স প্রিভেনশন গ্রুপ।

#### D. পরিচয়/ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি

* জন্মনিবন্ধন ক্যাম্পেইন: মোবাইল ক্যাম্প (সিটি কর্পোরেশন–DNCC/DSCC, LGD)–এনজিও–ইউনিসেফ সমন্বয়।
* ID-lite কার্যপ্রবাহ: অস্থায়ী Child Service Card → স্কুল/ক্লিনিক এক্সেস → চূড়ান্ত আইডি।
* ডিজিটাল কর্নার: সেফ-স্পেসে ট্যাব/কম্পিউটার, অফলাইন-ফার্স্ট কন্টেন্ট; বেসিক ডিজিটাল লিটারেসি।

#### E. জীবিকা ও পরিবার-পুনর্মিলন (Older Adolescents)

* দক্ষতা প্রশিক্ষণ: স্বল্পমেয়াদি ট্রেড (ফুড হ্যান্ডলিং, সাইকেল/মোবাইল রিপেয়ার, সেলাই)।
* Apprenticeship/Job-link: স্থানীয় MSME–র সাথে MoU; No-child-hazard স্ক্রিন।
* পরিবার-রিইউনিফিকেশন: রিস্ক-অ্যাসেসমেন্ট সহ; পরিবারে ক্ষুদ্র অনুদান/কাউন্সেলিং; ৩–৬ মাস ফলো-আপ।

### ৩) তথ্যব্যবস্থা (MIS) ও নজরদারি

* DSCC Street-Child Registry: হটস্পটভিত্তিক ইউনিক কেস-আইডি; ন্যূনতম ডেটাসেট (বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, আশ্রয়, নেশা, সহিংসতার ঝুঁকি)।
* ড্যাশবোর্ড (মাসিক): এনরোলমেন্ট, আশ্রয়-বেড ব্যবহার, স্বাস্থ্য-আউটরিচ, আইডি-ইস্যু, রিহ্যাব-রেফারাল, পুনঃরাস্তায়-ফেরা হার।
* কমপ্লায়েন্স/গুণগত মান: ১০% ব্যাক-চেক, ৫% রি-ইন্টারভিউ, ডাটা-অডিট; শিশু-সুরক্ষা ইনসিডেন্ট লগিং।
* এভিডেন্স-রাউন্ডটেবিল (ত্রৈমাসিক): সিটি, সমাজসেবা, এনজিও, গবেষক—ডাটা-শেয়ার/কোর্স-করেকশন।

### 

### ৪) বাস্তবায়ন সময়রেখা

* ফেজ-১ (০–৩ মাস): হটস্পট ম্যাপিং, স্টাফিং, SOP/IRB, ২টি পাইলট সেফ-স্পেস, ২টি মোবাইল স্কুল।
* ফেজ-২ (৪–১২ মাস): ৬টি সেফ-স্পেস স্কেল-আপ; ১০টি মোবাইল/নাইট-ক্লাস; ২০টি আউটরিচ-ক্লিনিক; ID ক্যাম্প।
* ফেজ-৩ (১৩–২৪ মাস): দক্ষতা–অ্যাপ্রেন্টিসশিপ; পরিবার-পুনর্মিলন স্কেল-আপ; পাবলিক-স্কুল লিংকেজ; ইম্প্যাক্ট ইভালুয়েশন।

### 

### ৫) অংশীদার ও ভূমিকা

* DSCC/সমাজসেবা/LGD: আশ্রয় অবকাঠামো, জন্মনিবন্ধন, নিরাপত্তা/পারমিট।
* শিক্ষা অফিস/বিদ্যালয়: ব্রিজ→মেইনস্ট্রিম ট্রান্সফার, সিটিং/মিড-ডে স্ন্যাক।
* স্বাস্থ্য দপ্তর/হাসপাতাল/NGO ক্লিনিক: আউটরিচ, টিকা, রেফারাল।
* আইনশৃঙ্খলা বাহিনী: শিশু-বান্ধব ডেস্ক, রাতের সেফ-প্যাসেজ, হ্যারাসমেন্ট-জিরো টলারেন্স।
* এনজিও কনসোর্টিয়াম: আউটরিচ, কেস-ম্যানেজমেন্ট, রিহ্যাব, দক্ষতা প্রশিক্ষণ।
* ডোনর/কর্পোরেট CSR: উপকরণ, আইটি, খাদ্য, স্টাইপেন্ড, ইন্টার্নশিপ।

### 

### ৬) ন্যূনতম বাজেট (ইঙ্গিতমূলক, বছরে)

* ৬টি Night Safe-Space: ~৳ ৩.৬–৪.২ কোটি (ভাড়া/পুনর্বাসন, স্টাফ, খাবার, নিরাপত্তা)।
* ১০টি মোবাইল/নাইট-ক্লাস ইউনিট: ~৳ ১.২–১.৫ কোটি (শিক্ষক, উপকরণ, স্ন্যাক, ট্রান্সপোর্ট)।
* স্বাস্থ্য আউটরিচ (২০ হটস্পট): ~৳ ০.৮–১.০ কোটি (ঔষধ, ভ্যান, নার্স/প্যারামেডিক)।
* ডিজিটাল কর্নার (৮টি) + আইডি ক্যাম্প: ~৳ ০.৪–০.৬ কোটি।
* কেস-ম্যানেজমেন্ট/ডাটা-সিস্টেম: ~৳ ০.৫ কোটি।
* মোট ইঙ্গিত: ৳ ৬.৫–৭.৮ কোটি/বছর (স্কেল/পার্টনারভিত্তিতে সামঞ্জস্যযোগ্য)।

### ৭) ঝুঁকি ও প্রশমন

* রাতের নিরাপত্তা: পুলিশ-প্রিনোটিস, কমিউনিটি ওয়াচ, GPS-টিম-ট্র্যাকিং।
* ডাটা সুরক্ষা: এনক্রিপ্টেড MIS, সীমিত এক্সেস, ডি-আইডেন্টিফাইড শেয়ারিং।
* স্টিগমা/আস্থা সংকট: সহপাঠী-মেন্টর, পিতামাতা/অভিভাবক জড়ানো, ধারাবাহিক আউটরিচ।
* রিল্যাপ্স/ড্রপ-আউট: কেয়ার-গ্রুপ, ইনসেনটিভ-স্টাইপেন্ড, দ্রুত ফলো-আপ।

### ৮) নৈতিকতা ও শিশু-সুরক্ষা

* Assent/Consent প্রটোকল, Best Interest নীতি, Do-No-Harm।
* রেফারাল পথ (২৪/৭): স্বাস্থ্য, সহিংসতা, আশ্রয়, আইনি সহায়তা।
* নগদ প্রণোদনা নয়; খাবার/উপকরণ/যাতায়াত সহায়তা।
* গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল: শিশু-বান্ধব অভিযোগ ব্যবস্থা।

### ৯) মূল্যায়ন ও প্রমাণ (M&E)

* বেসলাইন–মিডলাইন–এন্ডলাইন (১২/২৪ মাস): শিক্ষা, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, নেশা, আইডি–সব সূচকে।
* কোয়াসি-এক্সপেরিমেন্টাল (হটস্পট তুলনা) বা স্টেপ-উইজ ক্লাস্টার রোল-আউট—যেখানে সম্ভব।
* লার্নিং রিভিউ (৬ মাস পরপর): কাজ করে/করে না—শেখা এবং কোর্স-করেকশন।

### প্রত্যাশিত প্রভাব (২ বছরে)

* শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন ≥ ৩,০০০ শিশু, নিরক্ষরতা ৪৪% → ≤২৫%।
* রাতে রাস্তায় থাকা শিশু ≥৪০% হ্রাস নির্বাচিত হটস্পটে।
* গ্লু/ড্যান্ডি ব্যবহার ≥৩০% কমে, রিহ্যাব-রেফারাল ও ফলো-আপ বৃদ্ধি।
* জন্মনিবন্ধন/ডিজিটাল আইডি ≥ ১০,০০০; স্কুল/স্বাস্থ্য-সেবায় সংযুক্তি টেকসই হয়।

# পঞ্চম অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা

﻿

## ৫.১ শিক্ষাগত অবস্থা ও নিরক্ষরতার চিত্র

বাংলাদেশে প্রায় ৩৪ লাখ পিতামাতা-বিহীন পথশিশু রাস্তায় জীবনযাপন করছে। এই শিশুদের মধ্যে শিক্ষার অভাব চরম: ইউনিসেফ-সহায়িত জরিপে দেখা গেছে প্রায় ৭১.৮% পথশিশু পড়তে-লিখতে পারে না। অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৪৯.৬% পথশিশু কখনোই স্কুলে যায়নি এবং মাত্র ৩০.৪% শিশু প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ফলস্বরূপ, এখনও প্রায় ৫১.৬% পথশিশু কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নয়। এই তথ্যগুলো স্পষ্ট করে যে বাংলাদেশের পথশিশুরা ব্যাপকভাবে শিক্ষার বাইরে পড়ছে। শিক্ষাহীনতার কারণে তারা পুরো জীবনই বিবঞ্চনায় কাটাতে পারে। তাই সরকার ও এনজিও যৌথভাবে পথশিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা উদ্যোগ গ্রহণ করছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিসেফ প্রত্যেক গ্রামে অন্তত একজন সামাজিক কর্মী নিযুক্তের উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে পথে থাকা শিশুরা পুনর্বাসনমূলক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে। এই সহায়ক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে অনেক পথশিশুকে আবার শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

﻿

## ৫.২ পেশাগত সম্পৃক্ততা

শহরের পথশিশুরা সাধারণত অনানুষ্ঠানিক কাজের সাথে যুক্ত থাকে। জাতীয় জরিপে দেখা গেছে তারা আবর্জনা সংগ্রহ, ভিক্ষাবৃত্তি, চায়ের দোকান কিংবা কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অধিকাংশ পথশিশু দিনে প্রায় ৩০–৪০ ঘণ্টা কাজ করে মাত্র ১০০০ টাকার ক্ষুদ্র মজুরি পায়। এই কঠোর পরিশ্রমের কারণে অর্ধেকেরও বেশি শিশু কাজের সময় আঘাতপ্রাপ্ত বা সহিংসতার শিকার হয়। অপরদিকে, যারা মাদকাসক্তি থেকে বেরিয়ে আসে তারা প্রায়শই মাদক বিক্রয় বা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এই অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে যুক্ত হয়ে পথশিশুরা শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

﻿

## ৫.৩ নেশাজাত দ্রব্যে সম্পৃক্ততা

পথশিশুদের মধ্যে মাদকাসক্তি ব্যাপক এবং দ্রুত বাড়ছে। UNICEF ও নেশা নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের প্রতিবেদনে দেখা গেছে দেশের প্রায় ৫৮% পথশিশু কোনো না কোনো নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণ করে; অনেক শিশু ১০ বছর বয়সের আগেই মাদক সেবন শুরু করে। এদের মধ্যে গাঁজা, সিগারেট ও ফেনসিডিল জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি; এছাড়া স্বল্পমূল্যের গ্লু-স্নিফিংও প্রচলিত, কারণ এতে দ্রুত উষ্ণতা এবং ক্ষুধার বেদনা ভুলে যাওয়ার অনুভূতি পাওয়া যায়।

তবে এসব পদার্থ শিশুদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। WHO অনুসারে গ্লু-স্নিফিং শিশুদের সাময়িক স্বস্তির ভার্চুয়াল অনুভূতি দিলেও এর ফলে সহিংস আচরণ ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। অতিরিক্ত মাদকসেবনে পথশিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

﻿

## ৫.৪ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা

অনেক পথশিশু বিপন্ন জীবন থাকা সত্ত্বেও শিক্ষায় ফিরতে চায়। কারিতাস বাংলাদেশের জরিপে দেখা গেছে পথশিশুরা নিরাপদ বাসস্থান ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। যদিও অনেক শিশু লেখাপড়া করতে চায়, তবুও বর্তমানে ৫১.৬% পথশিশু কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নয়। এর একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো শতকরা ৫৮% পথশিশুর জন্মনিবন্ধন না থাকার কারণে তারা স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি।

এই অবস্থায় পথশিশুদের আবার শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ পুনর্বাসনমূলক শিক্ষা কেন্দ্র ও সহায়ক নীতিমালা প্রয়োজন। এই ধরনের উদ্যোগ এবং সামাজিক কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে পথশিশুরা নিরাপদ বাসস্থানের পাশাপাশি শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়ে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## ৬.১ এক নজরে ঢাকার শহরে পথশিশু নিয়ে যেসব এনজিও কাজ করে তাদের তালিকা

### ঢাকা শহরে সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের জন্য পরিচিত সেন্টারহোম ও ওপেন স্কুল সমূহ

### মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

* কার্যক্রম:
  + সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্যসুবিধা প্রদান
  + নিরাপত্তা আশ্রয় সুবিধা প্রদান
  + পথশিশুদের জন্য বিনোদনমূলক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার ব্যবস্থা করা
  + পথশিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা
  + উন্মুক্ত পথশিশু স্কুল পরিচালনা
* সেন্টার হোম/ওপেন স্কুল:
  + পথশিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র: রাজ্জাক টাওয়ার ২২ কাওলাপুর বাজার রোড, ঢাকা  
    ফোন: ০১৭১২৩৬৭৫১৭
  + পথশিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র: ২০/৩, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫  
    ফোন: ০১৭১২৩৬৭৫১৮

### মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

* কার্যক্রম:
  + নির্যাতনের শিকার নারীদের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে তারা ১২ বছরের নিচে শিশু সন্তানসহ ৬ মাস পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে
* সেন্টার হোম/ওপেন স্কুল:
  + মহিলা সহায়তা কেন্দ্র: লালমাটিয়া, ঢাকা  
    ফোন: ০১৯১১৩৬৩৬৯১

### অপরাজেয়

* কার্যক্রম:
  + পথের অবহেলিত ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের আশ্রয়
  + সুস্বাদু খাদ্য
  + স্বাস্থ্যসেবা
  + বিনোদন
  + উপ-আনুষ্ঠানিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা
  + কারিগরি প্রশিক্ষণ
  + জীবনের দক্ষতা
  + সমাজ ও পরিবারের পুনর্বাসন সেবা
  + শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুব্যাংকিং, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তকরণ
* Slum Children’s Programme:
  + মিরপুর এডুকেশন সেন্টার: বাড়ি নং-জি/২৭ এক্সটেনশন পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬  
    মীর মিজানুর রহমান: ০১৭১৩২৫৯২৪৮
  + মোহাম্মদপুর এডুকেশন সেন্টার: ২৯/৫-বি, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭  
    শাহীনা আরা: ০১৭১২৩৬৯১৮১
  + রায়েরবাজার এডুকেশন সেন্টার: ২৯/জি/৭ সিপাহীবাগ রিয়েল এস্টেট, রোড-৯ টালি অফিস রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯
  + আজিমপুর এডুকেশন সেন্টার: বাড়ি নং-২৬৭-২৬৯, রোড নং-জনগ্রহণাহা রোড, ঢাকা

### CACPV Project

* কার্যক্রম:
  + বোরেজ ক্লাব: ২০ নং বাজার রোড, ১ম তলা শামসুন ভবন, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬  
    শিরিন আক্তার, সেন্টার ম্যানেজার – ০১৯১৪৮৮৯৩৫৫
  + ড্রপ-ইন সেন্টার ও ক্লাব, যাত্রাবাড়ী – ৫৫/১ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী (২য় তলা)  
    শাহ আলম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক – ০১৭২৫৮৫৩৯১৯
  + ড্রপ-ইন সেন্টার কারওয়ান বাজার – ১৪০ পূর্ব তেজতুরী বাজার (২য় তলা) কারওয়ান বাজার, ঢাকা  
    সাইফুল ইসলাম – ০১৭১২৫৬৪৯৯৬

### PCAR Project Dhaka

* DIC Girls Club: বাড়ি নং-৯২, নতুন মডেল সদরঘাট রোড, ৩য় তলা, সাতরাস্তা, বংশাল, ঢাকা
* DIC Boys Club: ৬৫/৩ ওয়াটার অফিস রোড, ৪র্থ তলা, রহমতগঞ্জ, লালবাগ, ঢাকা-১২১১
* ইমারজেন্সি নাইট শেল্টার: ৮ নম্বর মিনার প্লাজা, ৩য় তলা, কাওরান বাজার, ঢাকা-১০০০

### অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

মিশন, পার্টনারস বাংলাদেশ, সিপ সোশ্যাল এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রাম, টিডিএস, ব্রেকিং দ্যা সাইলেন্স, অদম্য বাংলাদেশ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও পথশিশুদের পুনর্বাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, খাদ্য, বিনোদন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, মনোসামাজিক সহায়তা এবং বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট সেন্টার পরিচালনা করে।

# সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশমালা

## ৭.১ উপসংহার

এই গবেষণায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পথশিশুদের জীবনযাত্রা, আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য, নেশা, এবং ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ফলাফলে স্পষ্ট হয়েছে যে—

পথশিশুদের অধিকাংশের বয়স ১০–১৫ বছরের মধ্যে।

প্রায় অর্ধেক শিশু শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং মাত্র অল্পসংখ্যক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

জীবিকার জন্য হকারি, টোকাই কাজ, ভিক্ষাবৃত্তি ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশুদের বড় অংশ সম্পৃক্ত।

বাবা-মায়ের অনুপস্থিতি, দারিদ্র্য, পরিবার ভাঙন ও গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন তাদের রাস্তায় নামার প্রধান কারণ।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু নেশাজাতীয় দ্রব্যের সংস্পর্শে চলে যাচ্ছে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

তবুও প্রায় ৫৮% শিশু শিক্ষায় ফিরতে চায়, যা ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে।

এই ফলাফল প্রমাণ করে যে পথশিশুরা সমাজের বোঝা নয়; বরং সঠিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ এবং সহায়তার মাধ্যমে তারা সমাজের কার্যকর সম্পদে পরিণত হতে পারে।

## ৭.২ সুপারিশমালা

শিক্ষা ও পুনর্বাসন

পথশিশুদের জন্য ব্রিজ স্কুল, রাত্রীকালীন স্কুল ও অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ফেরাতে সিটি কর্পোরেশন ও এনজিওদের সমন্বিত কার্যক্রম দরকার।

নিরাপদ আশ্রয় ও সুরক্ষা

প্রতিটি হটস্পটে রাত্রীকালীন সেফ-শেল্টার স্থাপন করতে হবে।

শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা ও নেশামুক্তি কর্মসূচি

মোবাইল স্বাস্থ্য ইউনিট ও বিনামূল্যের ক্লিনিক চালু করা দরকার।

নেশামুক্তি কাউন্সেলিং ও পুনর্বাসন সেবা সম্প্রসারণ করতে হবে।

জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন

কারিগরি প্রশিক্ষণ, স্বল্পমেয়াদি কাজের সুযোগ এবং ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা প্রদান করে শিশুদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কারুশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদিতে দক্ষতা উন্নয়ন করা যেতে পারে।

সামাজিক সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

পথশিশুদের বিদ্যমান সেবা সম্পর্কে সচেতন করতে তথ্য প্রচারণা বাড়ানো জরুরি।

পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণে সামাজিক কর্মী ও এনজিওদের ভূমিকা জোরদার করতে হবে।

নীতিনির্ধারণ ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ

স্থানীয় সরকার পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।

সিটি কর্পোরেশনকে ওয়ার্ডভিত্তিক শিশু কল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় বাজেটে পথশিশু উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য আলাদা বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

## ৭.৩ সমাপনী মন্তব্য

পথশিশুর সমস্যা শুধু সামাজিক বা মানবিক সংকট নয়; এটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নগরায়ণ এবং জাতীয় অগ্রগতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় বিনিয়োগ শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, বরং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সাধারণ জনগণকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

# গ্রন্থপঞ্জি (References)

1. Prof. Dr. AKM Nur-Un-Nabi & Prof. Dr. Abul Hossain Ahmed Bhuya – Research Methodology.
2. Thomas de Benitez, Sarah (২০০৭). State of the World’s Street Children. Consortium for Street Children.
3. Children in Bangladesh – Street Children in Bangladesh.
4. End Poverty in South Asia. World Bank Blog.
5. Street Children in Bangladesh. That Knowledge. Archived ২৪ January ২০১৩.
6. Ten Facts about Children in Bangladesh. Bangladesh Development Research Center (BDRC).
7. Some Organizations that Help Children in Bangladesh. Bangladesh Development Research Center (BDRC).
8. Celebrating Victory through Volunteerism (২০১৩). One Degree Initiative.
9. Donate Today to Keep Global Strong! Global Voices.
10. Study Reveals Inadequate Access to EmONE Facilities in ২৪ Districts of Bangladesh. icddr,b.
11. Celebrating International Street Children Day (২০২২). INCIDIN Bangladesh.
12. JAAGO Schools Now Powered by Bangladesh’s First Online Classroom. JAAGO Foundation.
13. Bangladesh Helping the Street Children of Dhaka. Plan UK.
14. UNICEF (২০২৩). The State of the World’s Children: Bangladesh Report. UNICEF Bangladesh.
15. Save the Children (২০২২). Street Children and Urban Poverty in Dhaka. Save the Children International.
16. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (২০২১). Child Labour Survey in Bangladesh. Dhaka: BBS.
17. ILO (২০২২). Child Labour and Street Children in South Asia: Policy Gaps and Recommendations. International Labour Organization.
18. World Bank (২০২০). Urban Poverty and Vulnerability in Bangladesh. World Bank Report.
19. Azad, A. K. (২০১৯). Street Children in Dhaka City: A Sociological Analysis. Dhaka University Journal.
20. Rahman, M. M. (২০২০). Urban Migration and Street Children in Bangladesh. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).
21. JICA (২০১৮). Street Children and Social Protection in Bangladesh. Japan International Cooperation Agency.
22. Islam, S. & Hossain, M. (২০১৯). Health and Nutritional Status of Street Children in Bangladesh. BioMed Central Public Health.
23. Farhana, F. (২০২১). Drug Abuse and Street Children: Case Study of Dhaka City. Dhaka: BRAC University.
24. Khan, R. (২০২২). Street Children and Informal Economy of Dhaka. Asian Journal of Social Sciences.
25. Annual Report on Child Rights in Bangladesh (২০২১). Ain o Salish Kendra (ASK).
26. Ministry of Women and Children Affairs (MoWCA) (২০২০). Rehabilitation and Policy for Street Children in Bangladesh. Dhaka: Govt. of Bangladesh.
27. Rahman, L. (২০২০). Street Children’s Access to Education in Bangladesh: Challenges and Opportunities. Asian Development Perspectives.
28. icddr,b (২০২২). Health and Vulnerability of Urban Poor and Street Children. Dhaka: icddr,b.
29. Plan International (২০২০). Urban Safety and Street Children in Bangladesh. Plan International Report.
30. BRAC (২০১৯). Education for All: Street and Slum Children Program. Dhaka: BRAC.
31. Global Initiative for Street Children (২০২১). Street Children Worldwide and in Bangladesh. Global Report.
32. UNICEF & ILO (২০২২). Child Labour and Street Children Post-COVID in Bangladesh. Joint Report.
33. Habib, S. (২০২১). Street Children in Dhaka South City Corporation: An Ethnographic Study. Jahangirnagar University Journal of Sociology.
34. Bangladesh Shishu Academy (২০১৯). Street Children and Cultural Programs: Integration in Society. Dhaka.
35. Islam, N. (২০২২). The Future of Street Children: Policy Needs for Bangladesh. Journal of Social Development Studies.
36. World Health Organization (২০২২). Street Children, Drug Use, and Health Risks in Bangladesh. WHO South-East Asia Regional Office